একক ২৩ □ বাংলা ছন্দের পরিভাষা (প্রাথমিক পর্যায়)

গঠন

২৩.১ উদ্দেশ্য
২৩.২ প্রস্তাবনা
২৩.৩ মূলপাঠ-১ ঃ ছন্দ, তার উপাদান
২৩.৩.১ ছন্দ
২৩.৩.২ বর্ণ, ধ্বনি
২৩.৩.৩ অক্ষর, দল
২৩.৩.৪ মাত্রা, কলা
২৩.৩.৫ ছেদ, যতি
২৩.৪ সারাংশ-১
২৩.৫ অনুশীলনী-১
২৩.৬ মূলপাঠ-২ ঃ ছন্দের নানাবিভাগ
২৩.৬.১ পর্ব, পদ
২৩.৬.২ পর্বাঙ্গ, উপপর্ব
২৩.৬.৩ চরণ, পঙ্‌ক্তি
২৩.৬.৪ স্তবক, শ্লোক
২৩.৭ সারাংশ-২
২৩.৮ অনুশীলনী-২
২৩.৯ মূলপাঠ-৩ ঃ উচ্চারণের কয়েকটি স্বভাব
২৩.৯.১ সংশ্লেষ, বিশ্লেষ
২৩.৯.২ শ্বাসাঘাত, প্রস্বর
২৩.৯.৩ তান, মিল
২৩.১০ সারাংশ-৩
২৩.১১ অনুশীলনী-৩
২৩.১২ গ্রন্থপঞ্জি-৩

২৩.১ উদ্দেশ্য

২৩.২ প্রস্তাবনা

ছন্দ নিয়ে আলোচনার অর্থ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হয়ে দাঁড়ায় ছন্দ নিয়ে বিতর্ক বাড়ানো, বিভ্রান্তি ছড়ানো। এর কারণ, বাংলা ছন্দতত্ত্ব এখনো পুরোপুরি বিজ্ঞান হয়ে ওঠেনি । সেই ফাঁকে ছন্দ-ভাবুকেরা নতুন নতুন কথা বলেন, নতুন নতুন পরিভাষা তৈরি করে এর সংখ্যা বাড়িয়ে চলেন। এতে করে ছন্দ-ভাবনার আয়তন ক্রমশ বাড়ে এ কথা ঠিক, কিন্তু সেই বাড়তে থাকা আয়তনে নতুন শিক্ষার্থীরা দিশাহার হয়ে পড়েন, পথ হারিয়ে ফেলেন। এ সমস্যার সমাধান—ছন্দকে বিজ্ঞান হিসেবে দাঁড় করানো। এটা করতে গেলে আবশ্যক এমন নির্দিষ্ট কিছু পরিভাষা, যা সবার কাছে মান্য হতে পারে, যার প্রয়োগে বাংলা ছন্দের সূত্র এবং তত্ত্বগুলি শিক্ষার্থীর কাছে একটিমাত্র রূপ নিয়ে স্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট হতে পারে। যতক্ষণ তা না হচ্ছে, অন্তর্বর্তী কালের ব্যবস্থা হিসেবে ততক্ষণ শিক্ষার্থীর পক্ষে নির্ভরযোগ্য আশ্রয় হতে পারেন বাংলা ছন্দচর্চায় অগ্রণী ছান্দসিক **প্রবোধচন্দ্র সেন** আর **অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়**। এঁদের তৈরি এবং বাবহার করা অনেকগুলি পরিভাষা বাঙালি ছন্দ-জিজ্ঞাসুর কাছে এখনো শ্রদ্ধেয়। এঁদের ছন্দ-ভাবনা দুটি পৃথক স্রোতে প্রবাহিত হলেও কিছু কিছু পরিভাষা দুজনের কাছেই গ্রাহ্য, অবশ্য অনেকগুলিই রূপে বা অর্থে পৃথক। এর মধ্যে যেসব পরিভাষা তর্ক এড়িয়ে এঁদের শেখানো পদ্ধতিকেই বুঝতে সাহায্য করে, তেমন কয়েকটি নেওয়া হল।

অমূল্যধন আর প্রবোধচন্দ্রের প্রয়োগে রয়েছে প্রায় ৫০টি প্রধান পরিভাষা (শাখাপ্রশাখা বাদ দিয়ে)। দুজনের ভাগ প্রায় সমান সমান। এ থেকে বেছে নেওয়া হল ৩৬টি—কেবল অমূল্যধনের প্রয়োগ থেকে ১০টি, কেবল প্রবোধচন্দ্রের প্রয়োগ থেকে ১৪টি, আর দুজনের মিলিত প্রয়োগ থেকে ১২টি। পরিভাষাগুলির মধ্যে আবার ২টি ভাগ —২৩টি প্রাথমিক পর্যায়ের, বাকি ১৩টি ব্যাবহারিক পর্যায়ের। প্রাথমিক পর্যায়ের ২৩টি পরিভাষার ব্যাখ্যা প্রথম এককের বিষয়। ব্যাবহারিক পর্যায়ের ১৩টি পরিভাষা ব্যাখ্যাসহ সরাসরি ব্যবহার করা হবে দ্বিতীয় আর তৃতীয় এককে। প্রথম এককের মূলপাঠকে ৩টি অংশে ভাগ করা হল ৩টি পৃথক নামে। প্রথম অংশের নাম 'ছন্দ, তার উপাদান'—এতে আছে ৯টি পরিভাষা, দ্বিতীয় অংশ 'ছন্দের নানাবিভাগ'—এতে রয়েছে ৮টি, তৃতীয় অংশ 'উচ্চারণের কয়েকটি স্বভাব'-এ আছে বাকি ৬টি পরিভাষার পরিচয়।

নির্বাচিত পরিভাষার তালিকাটি এইরকম (মোট ৩৬টি)—

১। প্রাথমিক পর্যায়ের ২৩টি ঃ

প্রবোধচন্দ্রের প্রয়োগ থেকে ৯টি—দল, কলা, উপপর্ব, পদ, পঙ্‌ক্তি, শ্লোক, প্রস্বর, সংশ্লেষ, বিশ্লেষ।

অমূল্যধনের প্রয়োগ থেকে ৬টি—অক্ষর, ছেদ, পর্বাঙ্গ, চরণ, শ্বাসাঘাত, তান।

উভয়ের প্রয়োগ থেকে ৮টি—ছন্দ, বর্ণ, ধ্বনি, মাত্রা, যতি, পর্ব, স্তবক, মিল।

২। **ব্যাবহারিক পর্যায়ের ১৩টি ঃ**

প্রবোধচন্দ্রের প্রয়োগ থেকে ৫টি—দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত, মিশ্রবৃত্ত, প্রবহমানতা, মুক্তক।

অমূল্যধনের প্রয়োগ থেকে ৪টি—শ্বাসাঘাতপ্রধান, ধ্বনিপ্রধান, তানপ্রধান, চতুর্দশপদী।

উভয়ের প্রয়োগ থেকে ৪টি—ছন্দরীতি, ছন্দবন্ধ, পয়ার, অমিত্রাক্ষর।

২৩.৩ মূলপাঠ-১ ঃ ছন্দ, তার উপাদান

ধরুন, আপনি একটি পাকা বাড়ি তৈরির কথা ভাবছেন। এর জন্য আবশ্যক চুন, সুরকি, বালি, সিমেন্ট, কাঠ, লোহা—এ সব মাল-মশলা বা উপাদান। সঠিক অনুপাতে আর সঠিক পরিমাণে এদের মিশ্রণ আর সঠিক কৌশলে এদের প্রয়োগ ঘটলেই ক্রমশ গড়ে উঠবে একটি মজবুত বাড়ি। তেমনি, কবিতা লেখার উপাদান **বর্ণ**, কবিতা উচ্চারণের উপাদান **ধ্বনি, অক্ষর বা দল**। কবিতার ছন্দ নিয়ে যখন ভাবব, তখন কবিতার উপাদান হয়ে ওঠে ছন্দেরও উপাদান। কবিতার উপাদান ছাড়াও ছন্দ-গঠনের জন্য আবশ্যক হয় ছন্দের নিজস্ব আরো কয়েকটি উপাদান—**মাত্রা** বা **কলা** আর **যতি**, প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে **ছেদ**-এর ভূমিকা। সেই কারণে, ছন্দ আর তার উপাদানগুলির পরিভাষা হবে প্রথম এককের মূলপাঠের প্রথম অংশের বিষয়। মূলত একই উপাদানকে নির্দেশ করে—এ রকম ১টি করে পরিভাষা বেছে নেওয়া হবে অমূল্যধন আর প্রবোধচন্দ্রের প্রয়োগ থেকে। প্রয়োগের দিক থেকে প্রতি জোড়া পরিভাষার মধ্যে কোথায় মিল আর কোথায় পার্থক্য, তা আপনাদের দেখানো হবে দৃষ্টান্তের সাহায্য নিয়ে। **ছন্দ**-ই আমাদের আলোচনার মূল বিষয়, অতএব শুরুতেই একটু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এই পরিভাষাটি বুঝে নিন। তারপর ক্রমশ জেনে নিন ছন্দের ৮টি উপাদানের পরিভাষা আর তাদের পরিচয়।

২৩.৩.১ ছন্দ

'ছন্দ' কাকে বলব, এই নিয়ে দুজন ছান্দসিকের দু-রকমের কথা শোনা যাক।

১। 'যেভাবে পদবিন্যাস করিলে বাক্য শ্রুতিমধুর হয়' তাকে 'ছন্দ' বলতে চান অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়।

২। 'উচ্চারণ আর বিরামের সুশৃঙ্খল ও আবর্তনময় বিন্যাসকে 'ছন্দ' বলতে চান পবিত্র সরকার।

প্রথম কথাটির অর্থ—যেভাবে কথার পর কথা সাজালে শুনতে ভালো লাগে, তারই নাম ছন্দ। অর্থাৎ, কথা নয়, কথা সাজানোও নয়, ছন্দ আসলে কথা সাজানোর এমন একটি কৌশল বা শৃঙ্খলা যার গুণে কথা মধুর হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় কথাটির অর্থ—কথার উচ্চারণ, একটু থামা, আবার উচ্চারণ, আবার থামা—কথাগুলি আলাদা হলেও কথার উচ্চারণ আর বিরাম যদি পরপর একইভাবে বিশেষ একটি নিয়মে বা শৃঙ্খলায় ঘুরে ঘুরে আসে, তাহলে কথার এই বিশেষ নিয়মে ঘুরে-ঘুরে-আসা-টাই হবে ছন্দ।

তাহলে দেখছি, কেউ বলেন—কথা সাজানোর শৃঙ্খলাটাই ছন্দ, আবার কেউ বলতে চান—শৃঙ্খলার সঙ্গে কথা সাজানোটাই (বিন্যাসটাই) ছন্দ। মুখের ছন্দ বললে বুঝি কেবল মুখের গড়নটুকু, চলার ছন্দ বললে বোঝায় চলার ভঙ্গিটাই। কিন্তু, কবিতার ছন্দ বলতে বুঝব কথা সাজানো আর সাজানোর শৃঙ্খলা একই সঙ্গে।

কথার এই ছন্দ বক্তৃতায় থাকতে পারে, গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধের গদ্যে থাকতে পারে, কবিতায় তো থাকেই। আমরা যে ছন্দ নিয়ে এ পর্যায়ের আলোচনা করব, তা কেবল কবিতারই ছন্দ—আরো নির্দিষ্ট করে বলতে তা হবে কেবল বাংলা কবিতার পদ্যের ছন্দ।

এবারে বাংলা কবিতার একটি অংশ পড়ে পড়ে বুঝে নিই, কথার উচ্চারণ আর বিরামের এই খেলাটি কী রকম—

নৌকা ফি সন | ডুবিছে ভীষণ | রেলে কলিশন | হয় ||
হাঁটিতে সর্প | কুক্‌কুর আর | গাড়ি-চাপা-পড়া | ভয় ||

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লেখা 'হাসির গান' কাব্যের 'নন্দলাল' কবিতা থেকে নেওয়া এই দুটি ছত্রের প্রথম ছত্রটি পড়তে পড়তে ৪-বার থামলেন। 'নৌকা ফি সন' কথাটুকু উচ্চারণ করে একটু থামা, তারপর 'ডুবিছে ভীষণ' উচ্চারণ করে আর একটু থামা, এরপর 'রেলে কলিশন' উচ্চারণ ও আবার থামা, এবং সবশেষে ছোট্ট কথা 'হয়' উচ্চারণের পর একটু বেহশি থামা (|- চিহ্নের জায়গায় কম থামা আর ||-চিহ্নের জায়গায় বেশি থামা)। এবারে দ্বিতীয় ছত্রটি পড়ুন। লক্ষ করুন, একইভাবে 'হাঁটিতে সর্প' 'কুক্‌কুর আর' 'গাড়ি-চাপা-পড়া'—এই ৩টি কথার উচ্চারণের পর ৩ বার একটুখানি করে থামা, শেষ কথা ছোট্ট 'ভয়'-এর উচ্চারণ করেই পুরোপুরি থামা।

এখন আন্দাজ করুন এক-একটি কথার উচ্চারণের মাপ। উচ্চারণ শুনতে শুনতে কানে খুব সহজেই ধরা পড়ে যাবে—প্রথম ছত্রের প্রথম ৩টি কথা (নৌকা ফি সন, ডুবিছে ভীষণ, রেলে কলিশন) সমান মাপের, শেষ কথাটি (হয়) মাপে বেশ ছোটো। একইভাবে দ্বিতীয় ছত্রের প্রথম ৩টি কথা (হাঁটিতে সর্প, কুককুর আর, গাড়ি-চাপা-পড়া) পাশাপাশি সমান মাপের, শেষ কথাটি ('ভয়') ছোটো। এবারে ওপরে-নীচে মিলিয়ে দেখুন, প্রথম ছত্রের কথাগুলি পরপর নীচের ছত্রের কথাগুলির সঙ্গে সমান মাপের ('নৌকা ফি সন' আর 'হাঁটিতে সর্প' , 'ডুবিছে ভীষণ' আর 'কুক্‌কুর আর', 'রেলে কলিশন' আর 'গাড়ি-চাপা-পড়া', 'হয়' আর 'ভয়')। মাপগুলি অবশ্যই ইঞ্চি-সেন্টিমিটার বা মিনিট-সেকেন্ড ধরে নয়, কবিতার উচ্চারণ শুনে শুনে কান অভ্যস্ত হয়ে উঠলে সহজেই আমাদের বোধে তখন তৈরি হয়ে যায় কথার মাপের আন্দাজ।

বাংলা কবিতার উদ্ধৃত ছত্র দুটিতে আমরা এতক্ষণ কী দেখলাম ? দেখা গেল, এখানে ৮টি কথা এমনভাবে সমাজানো যে প্রতিটি ছত্রেই সমান মাপের এক-একটি কথার উচ্চারণের পর একটি করে ছোটো মাপের বিরাম পর পর ৩-বার একইভাবে (উচ্চারণ-বিরাম-উচ্চারণ-বিরাম-উচ্চারণ-বিরাম) ঘুরে ঘুরে আসে, শেষে ছোটো মাপের একটি কথার উচ্চারণের পর একটি বড়ো মাপের বিরাম। উচ্চারণ আর বিরামের এই ঘুরে ঘুরে আসা দুটি ছত্রে একইভাবে ঘটছে। কবি এমনি করে সাজিয়েছেন কথার উচ্চারণ আর বিরাম—একইভাবে পরপর ঘুরে ঘুরে আসার শৃঙ্খলায়। এই বিন্যাস আর শৃঙ্খলার গুণেই ছত্র দুটির অন্তর্গত কথাগুলি মধুর হয়ে শ্রোতার কানে বাজতে থাকে। তখনই তৈরি হয়ে যায় ছন্দ—কবিতার কথা শুনতে ভালোলাগার জাদু।

২৩.৩.২. বর্ণ, ধ্বনি

আমরা যা উচ্চারণ করি, তা লিখতে গেলেই চিহ্ন ব্যবহার করতে হয়। এই চিহ্নের নাম হরফ বা বর্ণ। কবিকেও কবিতা লিখতে হয় চিহ্নের পর চিহ্ন—বর্ণের পর বর্ণ সাজিয়ে। অতএব, বর্ণ চোখে দেখার জিনিস। যিনি কবিতা পড়েন, তিনি সাজানো বর্ণগুলির দিকে তাকিয়ে থেকেই সেগুলি একটার পর একটা উচ্চারণ করতে থাকেন, ক্রমে ক্রমে গোটা কবিতাই পড়া হয়ে যায়।

তাহলে দেখা গেল, কবি তাঁর কবিতা লেখেন বর্ণ বিন্যাস করে, পাঠক সেই কবিতা পড়েন বর্ণের পর বর্ণ উচ্চারণ করে। বর্ণের এই উচ্চারিত রূপটিই ধ্বনি। অতএব, ধ্বনি কানে শোনার জিনিস। পাঠক বর্ণ চোখে দেখে উচ্চারণ করেন, স্রোতা সেই উচ্চারণ থেকে ধ্বনি শুনতে থাকেন।

অর্থাৎ, কবিতা লেখা হয় বর্ণ দিয়ে, ছাপাও হয় বর্ণ দিয়ে। কিন্তু, যখন তা পড়া হয়, তখন সেই কবিতা ধ্বনির সমষ্টি হয়ে স্রোতার কানে পৌঁছয়। সেই ধ্বনির বিন্যাস থেকেই তৈরি হয়ে যায় কবিতার ছন্দ, এবং তা ধরা পড়ে শ্রোতার কানে।

বাংলায় আমরা ব্যবহার করি ১১টি স্বরবর্ণ ('ঌ' ব্যবহার করি না), কিন্তু উচ্চারণ করি ৭টি স্বরধ্বনি (অ আ ই উ অ্যা এ ও) ; ব্যবহার করি ৪০টি ব্যঞ্জনবর্ণ, উচ্চারণ করি মাত্র ২৯টি ব্যঞ্জনধ্বনি। তার অর্থ, আমাদের কবিরাও বাংলা কবিতায় প্রয়োগ করে থাকেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে. ১১টি স্বরবর্ণ আর ৪০টি ব্যঞ্জনবর্ণ (মোট ৫১টি)। কিন্তু, পাঠকের উচ্চারণে আর স্রোতার কানে ধরা পড়ে ৭টি স্বরধ্বনি আর ২৯টি ব্যঞ্জনধ্বনি (মোট ৩৬টি)। বাংলা কবিতার ছন্দ তৈরি হয় এই ৩৬টি ধ্বনির নানারকম বিন্যাস থেকে। অতএব, ছন্দের হিসেব করতে গিয়ে আমরা কানের সাক্ষ্যই মানব, চোখের সাক্ষ্য (অর্থাৎ বর্ণ, বানান এসব) যেন বিভ্রান্ত না করে—সেদিকে সতর্ক থাকব।

এবারে শুনি বর্ণ আর ধ্বনি নিয়ে ছান্দসিকেরা কী কী বলেন। বর্ণ শব্দের দৃষ্টরূপ, আর ধ্বনি শব্দের শ্রুতরূপ—এ কথা প্রবোধচন্দ্র সেন—অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় দুজনেই মানেন। কিন্তু, 'ধ্বনি' বোঝাতে দুজনেই অনেক সময় 'বর্ণ' কথাটি প্রয়োগ করে থাকেন। প্রবোধচন্দ্র বর্ণকে বা ধ্বনিকে সরাসরি স্বর-ব্যঞ্জনে ভাগ করেননি। তাঁর বর্ণ-বিভাগ এই রকম ঃ বাংলা বর্ণের সব মিলিটে ৪টি শ্রেণি —মুক্তস্বর, খণ্ডস্বর, রুদ্ধস্বর, আর ব্যঞ্জন। এটি আসলে তাঁর ধ্বনি বিভাগও, 'বর্ণ' কথাটির বদলে 'ধ্বনি' বসালেই হল। মুক্তস্বর ছ-টি—অ আ ই উ এ ও। যে কোনো মুক্তস্বর বাংলা উচ্চারণে হ্রস্ব হতে পারে, দীর্ঘও হতে পারে। অন্য স্বরের সহায়তা ছাড়াই এদের উচ্চারণ সম্ভব। ই উ এ ও—এই চারটি স্বর কখনও কখনও পরনির্ভর হয়ে পড়ে। তখনই তারা খণ্ডস্বর। তখন তাদের উচ্চারণের জন্য চাই মুক্তস্বরের আশ্রয়। মুক্ত 'আ'-এর পাশে খণ্ড 'ই' আশ্রয় নিলেই তৈরি হয় 'আ-ই' (খাই, নাই)। সঙ্গে সঙ্গে মুক্তস্বরের দরজাটি রুদ্ধ হয়ে যায়, তৈরি হয় রুদ্ধস্বর 'আই'। রুদ্ধস্বর হচ্ছে একটি মুক্তস্বর আর একটি খণ্ডস্বরের যৌথ উচ্চারণ। এমনি করে ৬টি মুক্তস্বর আর ৪টি খণ্ডস্বরের নানারকম মিলনে তৈরি হয় অন্ততপক্ষে ১৬টি রুদ্ধস্বর—অই (কই, সই), অউ (বউ) আও (যাও, খাও), ইউ (মিউ), উই (দুই), এই (সেই), ওএ (শোয়) ইত্যাদি। এই ১৬টি রুদ্ধস্বরধ্বনির মধ্যে কেবলমাত্র 'অই' আর 'অউ' ধ্বনির জন্য বরাদ্দ আছে 'ঐ' আর 'ঔ' বর্ণ। রইল বাকি ব্যঞ্জন। এদের উচ্চারণের জন্য চাই মুক্তস্বরের আশ্রয়—হয় আগে

মুক্তস্বর পরে ব্যঞ্জন (অপ্, আখ্, ইট্, উট্), না হয় আগে ব্যঞ্জন পরে মুক্তস্বর (প, খা, টি, টু), অথবা আগে-পরে দুদিকেই মুক্তস্বর মাঝখানে ব্যঞ্জন (আদা = আ-দ্-আ, ইনি = ই-ন্-ই)। ব্যঞ্জন যখন উচ্চারণ করব, তখন তা হবে ব্যঞ্জনধ্বনি, আর যখন লিখবে, তখন তার নাম ব্যঞ্জনবর্ণ।

অমূল্যধনের বিচারে 'বর্ণ' হচ্ছে '**লিখিত হরফ**'। বর্ণকে বা ধ্বনিক তিনি অবশ্য পরোক্ষে স্বর আর ব্যঞ্জনেই ভাগ করেছেন। স্বরধ্বনি তাঁর কাছে দুটি জাতিতে বিভক্ত—মৌলিক আর যৌগিক। অ আ ই উ অ্যা এ ও—এই ৭টি মৌলিক স্বর, ওই আই আও ইত্যাদি যৌগিক স্বর। দেখা গেল, প্রবোধচন্দ্রের ৬টি মুক্তস্বরই অমূল্যধনের কাছে মৌলিক স্বরধ্বনি, অমূল্যধনের 'অ্যা'-স্বরধ্বনিটি কেবল প্রবোধচন্দ্রের তালিকার বাইরে। আর, প্রবোধচন্দ্রের বুদ্ধস্বরের সঙ্গেও অমূল্যধনের যৌগিক স্বরের পার্থক্য খুব বেশি নেই।

২৩.৩.৩ অক্ষর, দল

'ধ্বনিবিজ্ঞান'-এর পাঠ থেকে আপনারা বাগ্‌যন্ত্র আর ধ্বনির কথা আগেই জেনেছিলেন (FBG : একক ৭ পৃ. ৪-৫), ধ্বনির কথা একটু আগে আরো বিশদভাবে জানলেন। আমাদের এক একটা ধ্বনির উচ্চারণ আসলে বাগ্‌যন্ত্রের নানা অংশের মিলিত চেষ্টার ফল। তবে ধ্বনির উচ্চারণ সাধারণত একটা একটা করে হয় না। একটানা কথা বলতে গেলে ধ্বনিগুলি পৃথকভাবে আমাদের কানে ধরা পড়ে না। বাগ্‌যন্ত্রের অংশগুলির একেবারের মিলিত চেষ্টার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ২-টি-৩টি ধ্বনির একসঙ্গে উচ্চারণ হয়ে যায়, কখনো-সখনো একটি ধ্বনিরই উচ্চারণ হয়। একেবারের চেষ্টার যে-কটি ধ্বনির উচ্চারণ একসঙ্গে হয়ে যায়, ইংরেজিতে তার নাম Syllable (beau-ti-ful), বাংলায় একে কেউ বলেন **অক্ষর**, কেউ বলেন **দল**।

একে **অক্ষর** বলেন অমূল্যধন। তাঁর দেওয়া সংজ্ঞাটি এই রকম ঃ 'বাগ্‌যন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তাহাই অক্ষর।' ধ্বনিবিজ্ঞানের মতে অক্ষর হচ্ছে বাক্যের অণু। একটি শব্দ ভাঙলে তা থেকে পাওয়া যাবে কয়েকটি অক্ষর। 'জননী' শব্দে অক্ষর আছে ৩টি—জ-ন-নী, 'শরৎ' শব্দে আছে ২টি অক্ষর—শ-রৎ। 'গুঞ্জন' শব্দেও ২টি অক্ষর—গুন্-জন্। এই ৩টি শব্দ ভেঙে যেসব টুকরো পাওয়া গেল, তার প্রত্যেকটিতেই আছে দুটি বা তিনটি করে ধ্বনি এবং তার উচ্চারণ হচ্ছে একঝোঁকে (জ = জ-অ, ন = ন্-অ, নী = ন্-ই, শ = শ্-অ, রৎ = র্-অ-ৎ, গুন্ = গ্-উ-ন্, জন্ = জ্-অ-ন্)। এই ৭টি অক্ষরের মধ্যে ২টি শ্রেণি লক্ষ্য করুন। জ-ন-নী-শ—এদের শেষ ধ্বনিটি স্বরধ্বনি (অ-অ-ই-অ), রৎ-গুন্-জন্—এদের শেষে আছে ব্যঞ্জনধ্বনি (ৎ-ন্-ন্)। অমূল্যধন শ্রেণিদুটির নাম দিলেন 'স্বরান্ত' (শেষে স্বরধ্বনি আছে বলে) আর 'হলন্ত' (শেষে যার ব্যঞ্জনধ্বনি)। তবে অক্ষরের শেষধ্বনি যৌগিক স্বর হলেও তাকে হলন্ত-ই বলা হবে। যেমন 'ভাসাই' = ভাসাই—এখানে 'ভা'-র শেষধ্বনি মৌলিক স্বর (আ) বলে এটি **স্বরান্ত**, আর 'সাই'-এর শেষধ্বনি যৌগিক স্বর (আই) বলে এটি **হলন্ত**। অতএব, স্বরান্ত অক্ষরের শেষধ্বনি কখনো ব্যঞ্জন, কখনো যৌগিক স্বর।

প্রবোধচন্দ্র Syllable-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'অক্ষর' কথাটির বদলে 'দল' কথাটি ব্যবহার করেন। তাঁর মতে দল হচ্ছে 'বাক্‌যন্ত্রের এক প্রয়াসে উচ্চারিত বাক্যভুক্ত ধ্বনিখণ্ড'। 'দল' 'ছন্দ' আর 'ছান্দসিক' শব্দতিনটি ভেঙে তিনি দেখালেন ১টি (দল্), ২টি (ছন্-দ) আর ৩টি (ছান্-দ-সিক) দল। প্রতিটি দলে থাকবে

একটিমাত্র স্বরধ্বনি (মুক্ত বা রুদ্ধ যা-ই হোক), ব্যঞ্জন থাক বা না-থাক। 'অসি', 'আতা', 'ইতি'—এই ৩টি শব্দের প্রথমেই আছে একটিমাত্র মুক্তস্বরধ্বনি দিয়ে তৈরি দল (অ-আ-ই), 'ঐকান্তিক' 'ঔদরিক' 'আইবুড়ো'—এই ৩টি শব্দের প্রথমে রয়েছে একটিমাত্র রুদ্ধস্বরধ্বনি দিয়ে তৈরি দল (ঐ-ঔ-আই) 'অগ্-নি', 'আল্-তা', 'ইন্-দু' শব্দের প্রথম দলে (অগ্-আল্-ইন্) রয়েছে ১টি মুক্ত স্বরধ্বনি (অ-আ-ই) আর একটি ব্যঞ্জনধ্বনি (গ্-ল্-ন্)। যেসব দলের শেষধ্বনি মুক্তস্বর, তার নাম **মুক্তদল** ; আর, যে দলের শেষে রুদ্ধস্বর (বৈ = ব্-ঐ, গৌ = গ্-ঔ, সাই = স্-আই) বা ব্যঞ্জনধ্বনি (অ-গ্, আ-ল্, ই-ন্), তার নাম **রুদ্ধদল**।

লক্ষ্য করুন, অমূল্যধনের 'অক্ষর' আর প্রবোধচন্দ্রের 'দল' একই। অমূল্যধনের 'স্বরান্ত অক্ষর'-ই প্রবোধচন্দ্রের 'মুক্তদল', আর অমূল্যধনের 'হলন্ত অক্ষর' প্রবোধচন্দ্রের কাছে 'রুদ্ধদল'। কাজের সুবিধার জন্য আমরা 'দল' কথাটিই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহার করব, এবং সাধ্যমতো সব রুদ্ধদলই মোটা হরফে দেখানো হবে।

২৩.৩.৪. মাত্রা, কলা

১. দুন্দুভি বেজে ওঠে ডিম্ ডিম্ রবে

২. ঘুমপাড়ানি মাসি পিসী ঘুম দিয়ে যাও

৩. বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান

৪. ঈশানের পুঞ্জমেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আসে

৫. জনগণমনঅধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা

৫টি কবিতা থেকে ৫টি ছত্র নেওয়া হল। প্রথম ছত্রটি উচ্চারণ করতে থাকুন। উচ্চারণ হবে এইরকম—'দু-ন্দুভি বেজে ওঠে ডি-ম্ ডি-ম্ রবে'। অর্থাৎ,স 'দুন্' 'ডিম্' 'ডিম'—এই ৩টি হলন্ত অক্ষর বা রুদ্ধদলের উচ্চারণ হবে টেনে টেনে, আর দু ভি বে জে ও ঠে র বে — এই ৮টি স্বরান্ত অক্ষর বা মুক্তদলের উচ্চারণ হবে কেটে কেটে। এবার দ্বিতীয় ছত্রটি উচ্চারণ করুন। একই রুদ্ধদল 'ঘুম্'-এর দুবার উচ্চারণ হচ্ছে দুভাবে—প্রথম 'ঘুম্'-এর উচ্চারণ পা ড়া নি মুক্তদল তিনটির মতোই কেটে কেটে—ঘুম্-পা-ড়া-নি, দ্বিতীয় 'ঘুম্'-এর উচ্চারণ 'ঘু-ম্' বা 'ঘুউম্'—অর্থাৎ খানিকটা টেনে। তৃতীয় ছত্রে দলগুলির উচ্চারণ লক্ষ্য করুন বিষ-টি প-ড়ে টা-পুর্ টু-পুর্ ন-দেয়্ এ-ল বান্—১৩টি দলই উচ্চারিত হল একইভাবে কেটে কেটে, এর মধ্যে বিষ্ পুর্ পুর্ দেয়্ বান্—এই ৫টি রুদ্ধদল, বাকি ৮টি মুক্তদল। চতুর্থ ছত্রে দেখুন ঃ নে-র্ মে-ঘ্ দলদুটি রুদ্ধদল, উচ্চারণ টেনে টেনে ; পুন্ অন্ দলদুটিও রুদ্ধদল, কিন্তু উচ্চারণ কেটে কেটে (পুন্-জ, অন্-ধ) ; প্রতিটি মুক্তদলেরই কাটা-কাটা উচ্চারণ। পঞ্চম ছত্রে একমাত্র রুদ্ধদল 'ভাগ্' বাদে আর প্রতিটি দলই মুক্তদল (বা স্বরান্ত অক্ষর)। কিন্তু, ঠিক ঠিক উচ্চারণ করে দেখুন—না হে ভা ধা তা মুক্তদল হলেও তাদের উচ্চারণ টেনে টেনে, বাকি মুক্তদলগুলির উচ্চারণ কেটে কেটে। 'ভাগ্' অবশ্য রুদ্ধদল (ভা-গ্ গ) এবং তার উচ্চারণ টেনে।

দেখা গেল, উদ্ধৃত ৫টি ছত্রে সব শুদ্ধ ১৬টি রুদ্ধদল (বা হলন্ত অক্ষর), এর মধ্যে ৯টির উচ্চারণ কেটে

কেটে, ৭টির উচ্চারণ টেনে টেনে ; অন্যদিকে সর্বমোট ৫৮টি মুক্তদলের (বা স্বরান্ত অক্ষরের) মধ্যে ৫৩টির উচ্চারণ কেটে কেটে, মাত্র ৫টির উচ্চারণ একটুখানি টেনে। এই হিসেব থেকে এটুকু বোঝা যায় যে, মুক্তদলের সাধারণ কাটা-কাটা উচ্চারণ, কিন্তু রুদ্ধদলের উচ্চারণ দুভাবেই হতে পারে। কোন্ দলের উচ্চারণ কীরকম হবে, সে কথায় আমরা পরে আসব। তার আগে বুঝে নিই, এই দু-রকমের উচ্চারণে আসল তফাত-টা কী।

প্রথম ছত্রের 'দুন্‌দুভি' কথাটি আর একবার উচ্চারণ করে দেখুন। এর ৩টি দলের উচ্চারণ দু-ন্ দু ভি—'দু-ন্' এর এই টানা উচ্চারণে যেটুকু সময় লাগে, 'দু' বা 'ভি'-র উচ্চারণে সময় লাগে তার চেয়ে কম। দ্বিতীয় ছত্রের প্রথম 'ঘুম'-এর কাটা-কাটা উচ্চারণ যেন একটু আচমকা তাড়াতাড়ি হয়ে যায়, তুলনায় দ্বিতীয় 'ঘু-ম্'-এর উচ্চারণ হয় একটু টেনে, খানিকটা বাড়তি সময় নিয়ে। দল মুক্ত হোক বা রুদ্ধ হোক, কেটে কেটে উচ্চারণ সব ক্ষেত্রেই সব কম সময় নিয়ে, আর টেনে টেনে উচ্চ্চারণ হলেই সময়ের ব্যয় হবে একটু বেশি। দলের উচ্চারণ-কালের এই কম-বেশিকে একটা হিসেবের মধ্যে ধরার জন্য এক ধরনের একক (Unit) তো চাই অনেকটা সেকেন্ড মিনিটের মতো। ছন্দ-বিজ্ঞানে এই এককই হল মাত্রা। এর অর্থ পরিমাণ বা মাপ, ছন্দেরর আলোচনায় এর অর্থ দল-উচ্চারণের মাপ। দলের উচ্চারণ যেখানে কাটা-কাটা, সময়ের ব্যয় সেখানে তুলনায় কম—দল সেখানে ১-মাত্রার। আর দলের উচ্চারণ সেখানে টেনে টেনে, তুলনায় একটু বেশি সময় নিয়ে,—সেখানে দল ২-মাত্রার।

এবারে চলুন ছান্দসিকদের দরবারে। অমূল্যধন মাত্রাকে বলেন অক্ষর-উচ্চারণের কালপরিমাণ, প্রবোধচন্দ্র একে বলেন দলের ধ্বনিপরিমাণ। 'মাত্রা' নিয়ে দুই শীর্ষ ছান্দসিকের বিতর্ক যখন মাত্রা ছাড়িয়ে গেল, তখন বিতর্ক এড়িয়ে অধ্যাপক পবিত্র সরকার 'মাত্রা'-কে দলের 'ওজন' হিসেবে ব্যাখ্যা করলেন। আমরা অবশ্য খানিকটা অমূল্যধন-ঘেঁষা সময়ের মাপের দিকেই ঝুঁকছি, তবে সেই সঙ্গো দলের উচ্চারণের চরিত্রটিও মাথায় রাখছি (কেটে-কেটে উচ্চারণ আর টেনে-টেনে উচ্চারণ)। কেটে-কেটে উচ্চারণে সময় কম লাগে, টেনে-টেনে উচ্চারণে সময় লাগে বেশি।

একটু আগে বলেছিলাম, মুক্তদলের উচ্চারণ সাধারণত কাটা-কাটা, আর রুদ্ধদলের উচ্চারণ কেটে কেটেও হয়, টেনে টেনেও হয়। এ কথার অর্থ—মুক্তদল সাধারণ ১-মাত্রার, আর রুদ্ধদল ১-মাত্রার বা ২-মাত্রার। ঠিক কোন্ রুদ্ধদলে ১-মাত্রা বা ২-মাত্রা, অথবা কোন্ অবস্থায় মুক্তদলে ২-মাত্রা, এসব নিয়ে পরে আমরা আলোচনা করব। তবে, কোন্ অক্ষরে বা দলে কত মাত্রা, এ নিয়ে অমূল্যধন আর প্রবোধচন্দ্র কার্যত কোনও বিরোধ নেই।

'মাত্রা'র কথা বলতে গিয়ে শুরুতেই যে ৫টি ছত্রের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, তাদের অন্তর্গত দলগুলি পরপর সাজিয়ে দিচ্ছি এবং প্রতিটি দলের মাথায় মাত্রা-চিহ্ন বসিয়ে দিচ্ছি (যে-দলের উচ্চারণ ১-মাত্রায় তার মাথায় ১, যে-দলের উচ্চারণ ২-মাত্রায় তার মাথায় ২)। দলের ঠিক ঠিক উচ্চারণ করে (হয় কেটে কেটে না-হয় টেনে টেনে) তার মাথায় বসানো মাত্রা সংখ্যার সঙ্গো মিলিয়ে ছত্রগুলি একটা-একটা করে পড়তে চেষ্টা করুন।

২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ২ ১ ১
১. দু-ন্ দু ভি বে জে ও ঠে ডি-ম্ ডি-ম্ র বে

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১
২. ঘুম্ পা ড়া নি মা সী পি সী ঘু-ম্ দি য়ে যাও

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১
৩. বিষ্ টি প ড়ে টা পুর্ টু পুর্ ন দেয় এ ল বান্

১ ১ ২ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১
৪. ঈ শা নে-র্ পুন্ জ মে-ঘ অন্ ধ বে গে
১ ১ ১ ১ ১ ১
ধে য়ে চ লে আ সে

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ২
৫. জ ন গ ণ ম ন অ ধি না য় ক জ য় হে
২ ১ ১ ২ ১ ১ ২ ২
ভা র ত ভা-গ্ গ বি ধা তা

চেনার সুবিধার জন্য বুদ্ধদলগুলি মোটা হরফে ছেপে দেওয়া হল।

এবারে লক্ষ্য করুন—

প্রথম ছত্রে প্রতিটি মুক্ত দলে ১-মাত্রা, প্রতিটি বুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

দ্বিতীয় ছত্রে প্রতিটি মুক্তদলে ১-মাত্রা, ২টি বুদ্ধদলে ১-মাত্রা, ১টি বুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

তৃতীয় ছত্রে প্রতিটি মুক্তদলে ১-মাত্রা, প্রতিটি বুদ্ধদলে ১-মাত্রা।

চতুর্থ ছত্রে প্রতিটি মুক্তদলে ১-মাত্রা, ২টি বুদ্ধদলে ১-মাত্রা, ২টি বুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

পঞ্চম ছত্রে প্রতিটি হ্রস্ব মুক্তদলে ১-মাত্রা, দীর্ঘ মুক্তদলে ২-মাত্রা, বুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

'মাত্রা'র আলোচনা থেকে আপনারা জানলেন, মুক্তদল বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ১-মাত্রার, কম ক্ষেত্রেই ২-মাত্রার। বুদ্ধদল ১-মাত্রার হতে পারে, ২-মাত্রারও হতে পারে। ১-মাত্রার দলে হ্রস্ব উচ্চারণ, ২-মাত্রর দলে দীর্ঘ উচ্চারণ—সে দল মুক্ত হোক বা রুদ্ধ রোগ। অর্থাৎ, মুক্তদল সাধারণত হ্রস্ব, দুটি-একটি ক্ষেত্রে দীর্ঘ হতে পারে, বুদ্ধদল হ্রস্ব বা দীর্ঘ দুই-ই হতে পারে। দৃষ্টান্ত দিই, উচ্চারণ করে বুঝে নিন—

	১ ১	১ ১	২	২	১ ১	১ ১	২
১.	চলি	চলি	পা	পা	টলি	টলি	যায়্

	১ ১ ১ ১	১ ১ ২	১ ১ ২	১ ১
২.	ভালোমন্দ	দুক্খসুখ্	অন্ধকার্	আলো

প্রথম দৃষ্টান্তে চ লি চ লি ট লি ট লি—প্রতিটি মুক্তদল হ্রস্ব, কিন্তু পা পা —দুটি মুক্তদল দীর্ঘ। আবার, দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে মন্ দুক্ অন্—তিনটি রুদ্ধদল হ্রস্ব, কিন্তু সুখ কার—দুটি রুদ্ধদলই দীর্ঘ।

দল হ্রস্ব হয় তখনই, যখন তার ভেতরকার ধ্বনি একটুখানি কুঁচকে যায়। আর, দলের দীর্ঘ হওয়ার অর্থ ধ্বনিগুলির আয়তনে বেড়ে যাওয়া। এইরকম একটি কোঁচকানো বা হ্রস্ব দলের সমপরিমাণ ধ্বনির নাম প্রবোধচন্দ্র দিয়েছেন কলা। অর্থাৎ একটি হ্রস্বদলের ধ্বনিপরিমাণ ১-কলা, একটি দীর্ঘদলের ধ্বনিপরিমাণ ২-কলা। ওপরের দৃষ্টান্ত-দুটিতে ১-মাত্রার প্রতিটি দলই হ্রস্ব এবং তাদের ধ্বনিপরিমাণ ১-কলা, ২-মাত্রার প্রতিটি দল দীর্ঘ এবং তাদের ধ্বনিপরিমাণ ২-কলা।

অতএব, মাত্রা আর কলার সম্পর্কটা দাঁড়াল এই রকম—প্রতিটি হ্রস্ব দলে থাকে প্রবোধচন্দ্রের হিসেবে ১-কলা, অমূল্যধনের হিসেবে ১-মাত্রা ; প্রতি দীর্ঘ দলে এঁদের হিসেবে ২-কলা বা ২-মাত্রা। অর্থাৎ, মাত্রা আর কলা কার্যত একই।

২৩.৩.৫ ছেদ, যতি

গোড়ার দিকে ছন্দের সংজ্ঞা নিয়ে অধ্যাপক পবিত্র সরকারের কথাটি আর একবার শুনে নিন। তাতে আছে 'উচ্চারণ' আর 'বিরাম'-এর উল্লেখ। এই 'বিরাম' বা পড়ার ফাঁকে ফাঁকে থামাটাই কখনো ছেদ, কখনো যতি। গদ্য-পদ্য যা-ই হোক, পড়তে পড়তে বা উচ্চারণ করতে করতে মাঝে মাঝে কম বা বেশি থামতে হয় প্রধানত তিনটি কারণে। প্রথম কারণ—না থামলে কথার অর্থ শ্রোতার কাছে অস্পষ্ট হয়ে পড়ে, দ্বিতীয় কারণ—না-থামলে দমে কুলোয় না, তৃতীয় কারণ—থামলে কথা শুনতে ভালো লাগে। প্রথম আর দ্বিতীয় কারণ মূলত গদ্য পড়ার ক্ষেত্রে, কখনো কখনো পদ্যের ক্ষেত্রে খাটে, তৃতীয় কারণটি খাটে মূলত পদ্য পড়ার ক্ষেত্রে। প্রথম দুটি কারণে যে-থামা, তার নাম ছেদ, তৃতীয় কারণে থামার নাম যতি। তার মানে, গদ্য পড়তে পড়তে অর্থ-বুঝে-নেওয়া আর দম-ঠিক-রাখার দায়িত্ব নিয়ে মাঝে মাঝে অনিয়মিত থামা—এর নাম ছেদ, আর কবিতার পদ্য উচ্চারণ করতে করতে ছন্দের তালে তালে নির্দিষ্ট সংখ্যক মাত্রার পরে নিয়মিত থামা—এর নাম যতি।

নীচের গদ্যটুকু পড়ুন—

'এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণগিরি। এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমাণ জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলংকৃত ; অধিত্যকাপ্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বানপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে,

সতত স্নিগ্ধ, শীতল, ও রমণীয় ; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবলবেগে গমন করিতেছে।'

বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস' থেকে নেওয়া এই গদ্য অংশ এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলা কতটা কষ্টসাধ্য, তা একটিবার পরীক্ষা করে দেখুন। আর, তেমন পড়ায় এ অংশে প্রস্রবণগিরির যে বর্ণনা রয়েছে, তাও স্পষ্ট হবে না। সেই কারণে লেখক নিজেই দাঁড়ি-সেমিকোলন-কমা দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন—কোথায় কতটুকু থামতে হবে। কমা কম থামার চিহ্ন আর দাঁড়ি সেমিকোলন পুরো থামার চিহ্ন। এই থামাটাই ছেদ। ছেদচিহ্নগুলি লক্ষ করলেই বোঝা যায় ছেদগুলি কতটা অনিয়মিত। ছেদের দ্বারা বিভক্ত ৭টি অংশ মাপে অনেকখানি ছোটো-বড়ো।

এবারে নীচের পদ্যটুকু পড়ুন—

দিনের আলো | নিবে এল | সূয্যি ডোবে | ডোবে || = ৪ + ৪ + ৪ + ২
আকাশ ঘিরে | মেঘ জুটেছে | চাঁদের লোভে | লোভে || = ৪ + ৪ + ৪ + ২

প্রথম ছত্রের মাঝখানে ৩-বার কম-থামা, শেষে পুরো থামা।

দ্বিতীয় ছত্রের মাঝখানে ৩-বার কম থামা, শেষে পুরো থামা।

প্রতিটি ছত্রের মাঝখানে ৩-বার করে থামার ফলে ৪টি করে টুকরো হল। প্রথম ৩টি টুকরো সমান মাপের (প্রতিটি ৪-মাত্রার), শেষেরটি ছোট (২-মাত্রার)। অর্থাৎ, এক-একটি ছত্র উচ্চারণ করার ফাঁকে ফাঁকে নির্দিষ্ট সংখ্যক মাত্রার পরে (এখানে ৪-মাত্রার পরে) নিয়মিত থামছি, শেষে আরো ২-মাত্রার উচ্চারণের পর পুরোপুরি থামছি। এই থামাটাই যতি। যতির পেছনে আছে ছন্দ-তালের শাসন, শুনতে ভালোলাগার আকাঙ্ক্ষা। অতএব, ছন্দ বুঝতে গেলে 'যতি'-কেই নিখুঁতভাবে চিনতে হবে, 'ছেদ'-কে তোয়াক্কা না করলেও চলবে।

অমূল্যধন ২-রকম যতির কথা বলেছেন—অর্ধযতি আর পূর্ণযতি। এক-একটি ছত্রের মাঝখানে একদাঁড়ি (।)-চিহ্ন দিয়ে দেখানো কম-থামার জায়গায় অর্ধযতি, জোড়াদাঁড়ি (।।)-চিহ্নে দেখানো পুরো থামার জায়গায় পূর্ণযতি। প্রবোধচন্দ্র শুনিয়েছেন ৫-রকম যতির ১০টি নাম—অনুযতি বা দলযতি, উপযতি বা উপপর্বযতি, লঘুযতি বা পর্বযতি, অর্ধযতি বা পদযতি, পূর্ণযতি বা পঙ্‌ক্তিযতি। এর মধ্যে ৩টি নাম আমাদের কাজে ব্যবহার করা হবে—পর্বযতি (অমূল্যধনের অর্ধযতি), পদযতি আর পঙ্‌ক্তিযতি (পূর্ণযতি)। এদের পরিচয় ক্রমশ জানবেন।

২৩.১.৪. সারাংশ-১

ছন্দ ঃ বাংলা কবিতার পদ্যে কথার পর কথা এমনভাবে সাজানো থাকে যে, কথার উচ্চারণ আর বিরাম পর পর একইভাবে ঘুরে ঘুরে আসে। এই কথা-সাজানো আর সাজানোর কৌশল বা শৃঙ্খলা—এই নিয়েই তৈরি হয় বাংলা কবিতার পদ্যের ছন্দ।

বর্ণ, ধ্বনি ঃ লিখতে গিয়ে যেসব চিহ্ন ব্যবহার করতে হয়, তার নাম হরফ বা বর্ণ। আর, বর্ণের উচ্চারিত রূপের নাম ধ্বনি। ছান্দসিকের ভাষায় বর্ণ শব্দের দৃষ্টরূপ, ধ্বনি শব্দের শ্রুতরূপ। অর্থাৎ, বর্ণ চোখে দেখার জিনিস, ধ্বনি কানে শোনার জিনিস। কবিতা লেখা হয় বর্ণ দিয়ে, পড়া হয় ধ্বনি দিয়ে।

বাংলা কবিতায় কবি ব্যবহার করেন ১১টি স্বরবর্ণ আর ৪০টি ব্যঞ্জনবর্ণ, পাঠক উচ্চারণ করেন ৭টি স্বরধ্বনি আর ২৯টি ব্যঞ্জনধ্বনি।

প্রবোধচন্দ্র বাংলা বর্ণ আর ধ্বনিকে ৪টি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন—মুক্তস্বর, খণ্ডস্বর, রুদ্ধস্বর আর ব্যঞ্জন। অমূল্যধন ভাগ করেছেন ২টি শ্রেণিতে—স্বর আর ব্যঞ্জন, স্বরের ২টি ভাগ—মৌলিক আর যৌগিক। প্রবোধচন্দ্রের মুক্তস্বর আর অমূল্যধনের মৌলিক স্বর প্রায় এক, রুদ্ধস্বর আর যৌগিক স্বরেও তেমন পার্থক্য নেই।

অক্ষর, দল ঃ বাগ্‌যন্ত্রের একেবারের চেষ্টায় যেকটি ধ্বনির উচ্চারণ একসঙ্গে হয়ে যায়, অমূল্যধন তাকে বলেন ‘অক্ষর’, প্রবোধচন্দ্র বলেন ‘দল’। যেসব অক্ষরের শেষে স্বরধ্বনি থাকে, তার নাম অমূল্যধনের ভাষায় ‘স্বরান্ত অক্ষর’। অক্ষরের শেষধ্বনি ব্যঞ্জন বা যৌগিক স্বর হলে তিনি তাকে বলেন ‘হলন্ত অক্ষর’। অন্যদিকে, প্রবোধচন্দ্রের ভাষায়—দলের শেষধ্বনি মুক্তস্বর হলে তা ‘মুক্তদল’, আর রুদ্ধস্বর বা ব্যঞ্জন বলে তার নাম ‘রুদ্ধদল’। অতএব, যা ‘অক্ষর’ তা-ই ‘দল’, যা ‘স্বরান্ত অক্ষর’ তা-ই ‘মুক্তদল’, যা ‘হলন্ত অক্ষর’ তাই ‘রুদ্ধদল’।

মাত্রা, কলা ঃ ‘মাত্রা’ কথাটির সাধারণ অর্থ পরিমাণ বা মাপ। ছন্দের আলোচনায় এর অর্থ দল বা অক্ষর উচ্চারণের মাপ, অধ্যাপক পবিত্র সরকারের ভাষায় ‘দলের ওজন’। যে দলের উচ্চারণ কেটে কেটে, তার মাপ বা ওজন কম—দল সেখানে হ্রস্ব এবং ১-মাত্রার। যে দলের উচ্চারণ টেনে টেনে, তার মাপ বা ওজন তুলনায় বেশি—দল সেখানে দীর্ঘ এবং ২-মাত্রার। মুক্তদল বা স্বরান্ত অক্ষর সাধারণত ১-মাত্রার, রুদ্ধদল বা হলন্ত অক্ষর কখনো ১-মাত্রার, কখনো ২-মাত্রার।

অমূল্যধন মাত্রাকে বলেন অক্ষর-উচ্চারণের কাল পরিমাণ, প্রবোধচন্দ্র একে বলেন দলের ধ্বনি-পরিমাণ। দলের ভেতরকার ধ্বনি কুঁচকে গেলে দল হয় হ্রস্ব। এই রকম হ্রস্ব দলের ধ্বনিপরিমাণ ১-কলা। দলের ধ্বনি আয়তনে বাড়লে দল হয় দীর্ঘ, এ রকম দলের ধ্বনিপরিমাণ ২-কলা।

অতএব, অমূল্যধনের ‘মাত্রা’ আর প্রবোধচন্দ্রের ‘কলা’-র মধ্যে কার্যত কোনও পার্থক্য নেই।

ছেদ, যতি ঃ কথার অর্থ স্পষ্ট বুঝে নেওয়া আর দাম ঠিক রাখা—এই ২টি প্রয়োজনে গদ্য বা পদ্য পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে অনিয়মিত যে থামা, তার নাম ‘ছেদ’। আর, কবিতার পদ্য উচ্চারণ করতে করতে ছন্দের তালে তালে নিয়মিত যে থামা, তরা নাম ‘যতি’। ছেদের জায়গা বোঝানোর জন্য

২-রকমের চিহ্ন ব্যবহার করা হয়—কম থামার চিহ্ন কমা (,) আর পুরো থামার চিহ্ন দাঁড়ি ; সেমিকোলন (।;) ইত্যাদি। অমূল্যধন ২-রকম যতির কথা বলেছেন—কম থামার নাম অর্ধযতি, পুরো থামার নাম পূর্ণযতি। অর্ধযতির চিহ্ন (|), পূর্ণযতির চিহ্ন (‖)।

২৩.৬ মূলপাঠ ঃ ছন্দের নানা বিভাগ

এত সমুদ্র জল টুকরো করতে করতে শেষপর্যন্ত এক ফোঁটা জল হাতে তুলে নেওয়া হয়। নোনা জলের নুনটুকু সরিয়ে বিশুদ্ধ জলের ফোঁটাকেও ভাঙতে ভাঙতে জলের অণু পর্যন্ত পৌছে যেতে পারেনা। এমন কী, ঐ অণুটিকে ভেঙে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের পরমাণুও পেয়ে যেতে পারেন। একইভাবে একটি কবিতাকে যদি টুকরো করতে থাকেন, তাহলে পৌঁছে যাবেন একটি অক্ষর বা দলের (Syllable) উচ্চারণে, আর, দলটিকেও ভাঙলে পাওয়া যাবে কয়েকটি ধ্বনি। দল যেন কবিতার অণু, ধ্বনি তাহলে পরমাণু। উল্টোদিক থেকে ভাবা যায় কয়েকটি পরমাণু মিলেমিশে যেমন অণুর গঠন, অসংখ্য অণুর জোড় লেগে যেমন এক-একটি পদার্থ তৈরি হতে পারে, তেমনি করে কয়েকটি ধ্বনির এক ঝোঁকে উচ্চারণে দল, আর দলের পর দলের উচ্চারণ হতে হতেই অবশেষে একটি গোটা কবিতার উচ্চারণ কানে বেজে ওঠে। এই ধ্বনির উচ্চারণ থেকে কবিতার উচ্চারণ হয়ে ওঠার পথে নানারকম ছন্দ-বিভাগ পেরোনোর ঘটনা ঘটে যায়। এই বিভাগগুলি চিনে নেওয়াই আমাদের এখনকার কাজ। উচ্চারণে প্রথম ধাপে 'ধ্বনি' আর 'দল' (বা 'অক্ষর')-কে ছন্দের মূল উপাদান হিসেবে আপনারা জেনেছেন। এবারে ক্রমে ক্রমে জেনে নিন পরের বিভাগগুলির কথা—ছান্দসিকেরা যাদের নাম দিয়েছেন, পর্বাঙ্গ বা উপপর্ব, পর্ব বা পদ, চরণ বা পঙ্ক্তি, শ্লোক বা স্তবক। সেইসঙ্গো ক্রমশ বুঝে নিন—যাতে কীভাবে উচ্চারণ-বিভাগগুলিকে নানারকম ছন্দ-বিভাগ বলে চিনিয়ে নেয়।

২৩.৬.১ পর্ব, পদ

রবীন্দ্রনাথের লেখা 'কড়ি ও কোমল' কাব্য থেকে 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' কবিতার প্রথম ছত্রটি আর একবার উচ্চারণ করুন—

দিনের আলো । নিবে এল । সূয্যি ডোবে । ডোবে ॥ = ৪ + ৪+ ৪+ ২

পর পর ৩টি লম্বা দাঁড়ি (।) দিয়ে কম-থামার জায়গাগুলি আর শেষে একজোড়া লম্বা দাঁড়ি (॥) দিয়ে পুরো-থামার জায়গাটি চিহ্নিত করা হল। এর ফলে কবিতার ছত্রটি ৪টি টুকরোয় ভাগ হয়ে গেল—৩টি সমান, শেষেরটি ছোটো। এই এক-একটি টুকরোই এক-একটি পর্ব। 'পর্ব' নিয়ে আরো বিশদ আলোচনায় একটু পরে আসছি। যে ৩টি লম্বা দাঁড়ি (।) দিয়ে ছত্রটিকে ৪টি পর্বে ভাগ করা হল তাকে অমূল্যধন বলেন 'অর্ধযতি'-র চিহ্ন, প্রবোধচন্দ্র বলেন 'পর্বযতি'-র চিহ্ন। ছত্রশেষের একজোড়া লম্বা দাঁড়ি (॥) অমূল্যধনের দেওয়া নাম 'পূর্ণযতি'-র চিহ্ন। পরপর ২টি যতির মাঝখানে রয়েছে এক-একটি পর্ব।

প্রথম ৩টি পর্ব যে সমান তার কারণ, প্রতিটি পর্বেই আছে ৪টি করে মাত্রা। প্রতিটি দলের মাথায় ১ বসিয়ে মাত্রা নির্দেশ করছি, উচ্চারণ করে করে প্রতিটি দলের ১-মাত্রা বুঝে নিতে চেষ্টা করুন—

১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ||
দি -নের্ আ- লো | নি-বে এ-ল | সুজ্-জি ডো-বে | ডো-বে || = ৪+৪+৪+২

আগেই জেনেছেন মুক্তদল (বা স্বরান্ত অক্ষর) সাধারণত ১-মাত্রার, রুদ্ধদল (বা হলন্ত অক্ষর) কখনো ১-মাত্রার, কখনো ২-মাত্রার। এখানে লক্ষ করুন—প্রতিটি মুক্তদল ১-মাত্রার বটেই, এমনকী প্রতিটি রুদ্ধদলও (নের্, সুজ্) ১-মাত্রারই হয়েছে।

লক্ষ্য করছেন, ছত্রটির পর্ব বিভাগ করে ২-রকম মাপের পর্ব পাওয়া গেল—৪-মাত্রার ৩টি আর ২-মাত্রার ১টি পর্ব। ৪টি পর্বের মধ্যে ৪-মাত্রার পর্ব ৩-বার ঘুরে ঘুরে এল পর পর। অতএব, ৪-মাত্রার পর্বই ছত্রটির মূলপর্ব, মাপের দিক থেকে এটি পূর্ণ। এর নাম **পূর্ণপর্ব**। ছত্রের শেষ পর্বটি 'পূর্ণপর্বে'র চেয়ে ছোট মাপের—২-মাত্রার। অতএব, পর্বটির নাম **অপূর্ণপর্ব** এবার নীচের ছত্রদুটি পড়ুন—

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ |
তোমরা চাহিলে সবে | সে পাত্‌র **অক্‌খয়্** হবে |
১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ||
ভিক্‌খা অন্‌নে বাঁচাব বসুধা || = ৮+৮+১০

এতে আছে ৩টি পর্ব—প্রথম ২টি পর্ব পরপর ৮-মাত্রার, শেষপর্ব ১০-মাত্রার। ৮-মাত্রার পর্ব ঘুরে ঘুরে এল ২-বার পরপর। অতএব, ৮-মাত্রাই এখানে মূল পর্বের পুরো মাপ, ৮-মাত্রার পর্বই 'পূর্ণপর্ব'। অথচ, শেষ পর্বটির ১০-মাত্রা পূর্ণপর্বের মাপ ছাড়িয়ে গেছে। অমূল্যধনের পথ ধরে এ-পর্বকে বলা হবে 'অতিপূর্ণ পর্ব'।

২ ১ ১ ১ ১ | ২ ||
(বল) উন্‌নত মম | শির || = ৬ + ২
১ ১ ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ২ ২ | ১ ২ ১ ২ | ২ ||
(শির) নেহারি আমারি | নতশির্ ওই | শিখর্ হিমাদ্ | রির্ || = ৬ + ৬ + ৬ + ২

প্রথম ছত্রটিতে প্রথম পর্ব ৬-মাত্রার, দ্বিতীয় পর্ব ২-মাত্রার। কোনও পর্বই ঘুরে ঘুরে আসে নি। তবু প্রথম পর্বকেই গণ্য করা হবে পূর্ণপর্ব বলে। দ্বিতীয় পর্ব পূর্ণপর্বের চেয়ে মাপে ছোটো বলে অপূর্ণপর্ব হিসেবে গণ্য হবে। দ্বিতীয় ছত্রে অবশ্য ৬-মাত্রার পর্ব পর পর ৩-বার ঘুরে ঘুরে এসে পূর্ণপর্ব হবার দাবি কায়েম করেছে। শেষপর্ব তার চেয়ে ছোটো বলে অবশ্যই অপূর্ণপর্ব। কিন্তু, লক্ষ করুন, ২টি ছত্রেরই শুরুতে বন্ধনীর মধ্যে ১টি করে ২-মাত্রা মাপের ছোটো পর্ব রয়েছে। পর্বদুটি ছন্দের হিসেবের বাইরে, ছন্দের পক্ষে যেন খানিকটা বাড়তি বোঝা, না থাকলেও ছন্দের ক্ষতি হত না। এ ধরনের পর্বকে ছান্দসিকেরা বলে অতিপর্ব। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ছত্রের শুরুতেই এসব পর্ব কবিরা বসান, কখনও কখনও ছত্রের মাঝখানে—

ভবের গাছে । বেঁধে দিয়ে (মা) ।পাক দিতেছ । অবিরত ।।

'মা' এখানে ছত্রটির মাঝখানে-থাকা 'অতিপর্ব'।

কম-থামার জায়গায় অর্ধযতি আর পুরো থামার জায়গায় পূর্ণযতি—অমূল্যধনের হিসেবমতো এই ২-রকম থামা বা যতির মাঝখানে প্রবোধচন্দ্র লক্ষ্য করলেন আর এক রকমের থামা বা যতি, যা কম-থামার চেয়ে একটু বেশি, অথচ পুরো-থামার চেয়ে একটু কম। এর নাম 'পদযতি'। অমূল্যধনের অর্ধযতিকে প্রবোধচন্দ্র বলেন পর্বযতি। অর্ধযতি বা পর্বযতি কবিতার ছত্রকে পর্বে পর্বে ভাগ করে দেখায়। তেমনি পদযতির কাজ পদ-বিভাগ করে দেখানো। পদযতি পর্বযতির চেয়ে একটু বেশি থামায়। একজোড়া লম্বা দাঁড়ি (।।) দিয়ে অমূল্যধন দেখান পূর্ণযতি, প্রবোধচন্দ্দর দেখান পদযতি। 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর'-এর ছত্রটিতে (।।) চিহ্ন দিয়ে দেখানো পদযতিটি চিনে নিন। ক্রমশ বুঝে নিন পদ-বিভাগের তত্ত্ব, পর্ব আর পদের পার্থক্য—

১ ১   ১ ১ | ১ ১ ১ ১ || ১ ১ | ১ ১ | ১ ১
দিনের অলো | নিবে এল || সুজ্ জি | ডোবে | ডোবে = (৪ + ৪) + (৪ + ২)

পদযতি (||) এখানে ছত্রটিকে ২টি খণ্ডে ভাগ করেছে, এক-একটি খণ্ড এক-একটি 'পদ'। প্রথম পদ তৈরি হয়েছে ২টি সমান মাপের পর্ব নিয়ে (৪+৪), দ্বিতীয় পদ তৈরি হয়েছে ২টি ছোটো-বড়ো পর্ব নিয়ে (৪+২)। অতএব, পর্বের চেয়ে 'পদ' বড়ো মাপের খণ্ড। কয়েকটি পর্ব নিয়ে তৈরি হয়ে এক একটি 'পদ'। ছত্রটিতে আছে ৪টি পর্ব, কিন্তু ২টি পদ।

লক্ষ্য করুন, ওপরের ছত্রটিতে পর্বের মাপ অমূল্যধন আর প্রবোধচন্দ্রের হিসেবমতো একই (প্রথম ৩টি ৪-মাত্রার, শেষেরটি ২-মাত্রার)। অতএব, অমূল্যধনের ২টি করে 'পর্ব' নিয়েই তৈরি হয়েছে প্রবোধচন্দ্রের এক-একটি 'পদ'।

এবারে পড়ুন 'কড়ি ও কোমল' কাব্যেরই আর-একটি কবিতা 'প্রাণ'-এর দ্বিতীয় ছত্রটি—

'মানবের্ মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই'।

ছত্রটির পর্ব-বিভাগ আর পদ-বিভাগ প্রবোধচন্দ্র করবেন এইভাবে—

১ ১ ২ | ১ ১   ১ ১ || ১ ১ ১ ১ | ২
মানবের | মাঝে   আমি || বাঁচিবারে | চাই   =(৪+৪)+ (৪+২)

প্রথম ৩টি পর্বের মাপ ৪-মাত্রা করে, শেষপর্ব ২-মাত্রার। আর প্রথম পদটির মাপ ৮-মাত্রা (৪+ ৪), দ্বিতীয় পদের মাপ ৬-মাত্রা (৪+২)।

অন্যদিকে, অমূল্যধনের পর্ব-বিভাগ হবে এইরকম—

মানবের্   মাঝে   আমি | বাঁচিবারে চাই || = ৮+৬

প্রথম পর্ব ৮-মাত্রার, শেষপর্ব ৬-মাত্রার।

ওপরের ছত্রটির ছন্দ-বিভাগ থেকে প্রবোধচন্দ্রের 'পর্ব' আর 'পদ'-এর সঙ্গো অমূল্যধনের পর্বের সম্পর্ক বিষয়ে ২টি কথা লক্ষ করুন ঃ

(১) পূর্ণপর্ব প্রবোধচন্দ্রের হিসেবে এখানে ৪-মাত্রার, অমূল্যধনের হিসেবে ৮-মাত্রার। অর্থাৎ, দুই ছান্দসিকের পর্বের মাপ দু-রকম।

(২) প্রবোধচন্দ্রের হিসেবে ২টি পদ ৮ আর ৬ মাত্রার, অমূল্যধনের হিসেবে ২টি পর্ব ৮ আর ৬ মাত্রার। অর্থাৎ, প্রবোধচন্দ্রের কাছে যা 'পদ', অমূল্যধনের কাছে তা 'পর্ব'।

সব মিলিয়ে দাঁড়াল এই ঃ 'পর্ব' আর 'পদ' নিয়ে প্রবোধচন্দ্র আর অমূল্যধনের হিসেবে আছে কিছু মিল, কিছু গরমিল। দুজনের 'পর্ব' কখনও সমান, কখনো ছোটো-বড়ো। সেই কারণে, প্রবোধচন্দ্রের 'পদ' কখনো অমূল্যধনের 'পর্বে'র সমান, কখনো বড়ো। 'পদ'-এর কথা অমূল্যধন ভাবেননি।

২৩.৬.২ পর্বাঙ্গ, উপপর্ব

'পর্ব', সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা তৈরি হয়ে গেল। বোঝা গেল, কবিতার একটি ছত্র উচ্চারণ করতে করতে মাঝে মাঝে যে যতি পড়ে (অর্থাৎ থামতে হয়), সেই যতির জায়গাটিতে এক-একটি পর্ব তৈরি হতে থাকে। পর্বগুলি পাশাপাশি সমান হবার কথা, তবে শেষপর্ব ছোটো (বা বড়ো) হতে পারে।

এই 'পর্ব'-কে মাঝখানে রেখে ছান্দসিকেরা একদিকে পর্বের চেয়ে মাপে ছোটো, আর একদিকে পর্বের চেয়ে মাপে বড়ো ছন্দ-বিভাগের কথাও ভেবেছেন। ছোটো মাপের বিভাগটাই আগে দেখুন। 'দিনের আলো' দিয়ে শুরু-করা ছত্রটি আর একবার উচ্চারণ করুন—

১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ‖
দিনের্ আলো | নিবে এল | সুজ্‌জি ডোবে | ডোবে ‖

'দিনের্ আলো' পর্বটির 'দিনের' 'আলো'—এই দুটি অংশে ভাগ হয়ে উচ্চারণ হচ্ছে। ফলে ৪-মাত্রার পর্বটি ২+২ মাত্রায় আবার ২টি টুকরো হচ্ছে। একইভাবে 'নিবে এল' আর 'সুজ্‌জি ডোবে' পর্বদুটিও ২+২ মাত্রায় ভাগ হয়ে যাচ্ছে। শেষের 'ডোবে' পর্বটি অবশ্য ২-মাত্রাতেই থেকে গেল, ভাগ হল না। পর্বের এই ভাগগুলিকে অমূল্যধন বলেন **'পর্বাঙ্গ'** (=পর্বের অঙ্গ), প্রবোধচন্দ্র বলেন **উপপর্ব** (=পর্বের স্বাভাবিক উচ্চারণ-বিভাগ)। 'পর্বাঙ্গে'র চিহ্ন (:), 'উপপর্বের চিহ্ন (:)। এই চিহ্ন দিয়ে ছত্রটি সাজিয়ে দেখুন—

পর্বাঙ্গ ঃ দিনের : আলো । নিবে : এল । সুজ্‌জি : ডোবে । ডোবে
উপপর্ব ঃ দিনের : আলো । নিবে : এল । সুজ্‌জি : ডোবে । ডোবে

অমূল্যধনের 'পর্বাঙ্গ' আর প্রবোধচন্দ্রের 'উপপর্ব' পর্বেরই এক-একটি ভাগ। কিন্তু, পর্বাঙ্গ আর উপপর্ব সবসময় হুবহু এক নয়। এর কারণ, অমূল্যধনের 'পর্ব' আর প্রবোধচন্দ্রের 'পর্ব' সবসময় মাপে এক হয় না। কেন হয় না তা আমরা পরে দেখব। 'দিনের আলো'-র ছত্রটিতে অবশ্য প্রথম ৩টি পর্ব জুদনের হিসেবেই সমান

মাপের (৪-মাত্রার), সে-কারণে পর্বাঙ্গ-উপপর্বও সমান হতে পেরেছে (২-মাত্রার)। কিন্তু নীচের ছত্রটিতে দেখুন—

পর্বাঙ্গ ঃ একা দেখি : কুল বধূ | কে বট : আপনি ‖ = (৪+৪) +(৩ + ৩)
উপপর্ব ঃ একা : দেখি | কুল : বধূ ‖ কে বট : আপনি = (২+ ২) +(২+ ২)+ (৩+ ৩)

অমূল্যধনের হিসেবে ছত্রটিতে ২টি পর্ব, প্রথমটি ৮-মাত্রার। ৮-মাত্রার প্রথম পর্বে পাওয়া গেল ৪-মাত্রার ২টি পর্বাঙ্গ। অথচ, ৮-মাত্রার এই পর্বটিই প্রবোধচন্দ্রের হিসেবে ২টি ৪-মাত্রার পর্বে ভাগ হল, ৪-মাত্রার এক-একটি পর্বে পাওয়া গেল ২-মাত্রার ২টি করে উপপর্ব। 'কে বট আপনি'-অংশটি অমূল্যধনের কাছে ৬-মাত্রার পর্ব, ভাগ হল ৩-মাত্রার ২টি পর্বাঙ্গে। আর, এ অংশটি প্রবোধচন্দ্রের কাছে ৬-মাত্রার একটি পদ, কিন্তু, সরাসরি এর ভাগ হল ৩-মাত্রার ২-টি উপপর্বে (পদটিকে পর্বে পর্বে ভাগ করা সম্ভব নয় বলে)। পর্বাঙ্গ-উপপর্বের মাপটাও সেই কারণেই সমান (৩-মাত্রার)। অতএব দেখলেন, একই কবিতার একই ছত্রে সব পর্বে মাপ ছান্দসিকদের কাছে সমান হয় না, তার ফলে পর্ব কেটে-কেটে-পাওয়া পর্বাঙ্গ আর উপপর্বও অসমান হয়ে পড়ে।

এক-একটা পর্ব যে ২টি-৩টি টুকরোয় ভাগ হতে পারে, এ নিয়ে কোনো সংশয় নেই। তবে, পর্বের মাঝখানে সত্যিই থামতে হয় কিনা—অর্থাৎ যতি পড়ে কিনা এ বিষয়ে ছান্দসিকেরা একমত নন। অমূল্যধনের মতে পর্বের মাঝখানে যতি নেই, (:) চিহ্নটিও যতিচিহ্ন নয়)। প্রবোধচন্দ্রের মতে যতি অবশ্যই আছে, যতিই পর্বকে উপপর্বে ভাগ করে এবং সে-যতির নাম উপযতি।

২৩.৬.৩. চরণ, পঙ্‌ক্তি

পর্বের চেয়ে ছোটো ছন্দ-বিভাগের কথা হল। এবারে বড়ো বিভাগের কথা। একটু আগেই আমরা দেখলাম যতির আঘাতে 'দিনের আলো'-র ছত্রটির ৪টি পর্বে ভাগ হওয়ার এবং ছত্রটির শেষে পুরো থেমে যাওয়ার ঘটনা। এই পুরো থামার যতিকে বলা হয় 'পূর্ণযতি', আর শুরু থেকে পূর্ণযতি পর্যন্ত পুরো ছত্রটির নাম অমূল্যধনের কাছে **চরণ**, প্রবোধচন্দ্রের কাছে **পঙ্‌ক্তি**। অর্থাৎ, পূর্ণযতি দিয়ে ভাগ-করা ছন্দ-বিভাগকেই অমূল্যধন বলছেন 'চরণ', প্রবোধচন্দ্র বলেছেন 'পঙ্‌ক্তি'। প্রবোধচন্দ্র এই কারণে 'পূর্ণযতি'-কে আরো নির্দিষ্ট করে বললেন 'পঙ্‌ক্তিযতি'। সেদিক থেকে 'চরণ' আর 'পঙ্‌ক্তি'-র মধ্যে তফাত থাকার কথা ছিল না। কিন্তু, 'চরণ' বা 'পঙ্‌ক্তি'র মাপ যে নির্দিষ্ট করে দেয়, সেই পূর্ণযতিই ঠিক কোথায় পড়বে (অর্থাৎ, পর্বের পর পর্ব পেরিয়ে কোন্ পর্বের শেষে পুরোপুরি থামতে হবে)—এই নিয়ে ছান্দসিক দুজন সব সময় একমত নন। তার ফলেই 'চরণ' আর 'পঙ্‌ক্তি' কখনো কখনো পৃথক্ হয়ে যায়।

'দিনের আলো'র ছত্রটি চরণ বটে, পঙ্‌ক্তিও বটে—এটা আমরা দেখলাম। সমান মাপের চরণ-পঙ্‌ক্তি আরো দুটি-একটি দেখা যাক।

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ | ১ ২ ১ ১ ১ ||
১ম চরণ মরিতে চাহিনা আমি | সুন্দর ভুবনে || = ৮+ ৬ = ১৪ মাত্রার

১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ ২ ||
২য় চরণ মানবের মাঝে আমি | বাঁচিবারে চাই || = ৮+ ৬ = ১৪ মাত্রার

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ || ১ ২ ১ ১ ১
১ম পঙ্‌ক্তি মরিতে চাহিনা আমি || সুন্‌দর ভুবনে = ৮+ ৬ = ১৪ মাত্রার
১ ১ ২ | ১ ১ ১ ১ || ১ ১ ১ ১ ২
২য় পঙ্‌ক্তি মানবের্ | মাঝে আমি || বাঁচিবারে চাই = ৪+ ৪+ ৪+ ২ = ১৪ মাত্রার

এখানে মাত্রা বসেছে এই নিয়মে—প্রতি মুক্তদলে (বা স্বরান্ত অক্ষরে ১-মাত্রা, শব্দের-প্রথমে-থাকা 'সুন্' রুদ্ধদলেও (বা হলন্ত অক্ষরে) ১-মাত্রা, শব্দের-শেষে-থাকা প্রতি রুদ্ধদলে ২-মাত্রা। লক্ষ করুন, ২টি ক্ষেত্রেই পূর্ণযতি (পুরো থেমে-যাওয়া) পড়ছে ছত্রের শেষে ১৪-মাত্রার পরে। অতএব, চরণ আর পঙ্‌ক্তির মাপে কোনো পার্থক্য রইল না। পার্থক্য কেবল এদের ছন্দ-বিভাগে। প্রথম চরণ ৮ +৬ মাত্রার ২টি পর্বে ভাগ হয়ে গেছে, আর প্রথম পঙ্‌ক্তির ভাগ হয়েছে ৮ + ৬ মাত্রায় ২টি পদে। দ্বিতীয় চরণে ২টি পর্ব (৮+৬), কিন্তু দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে ৪টি পর্ব (৪+৪+ ৪+২)।

এবারে দেখুন একটি পৃথক্ মাপের চরণ পঙ্‌ক্তির দৃষ্টান্ত—

১ ১ ১ ১ ২ | ১ ১ ২ ২ | ২ ১ ১ ||
এ নহে মুখর্ | বনমর্মর্ | গুন্‌জিত ||

১ ১ ১ ১ ২ | ১ ১ ১ ১ ২ || ১ ১ ১ ||
এ যে অজাগর্ | গরজে সাগর্ || ফুলিছে ||

অমূল্যধনের হিসেবে এখানে ২-বার পূর্ণযতি, তাই ২-টি চরণ। কিন্তু, প্রবোধচন্দ্র প্রথম ছত্রের শেষে পূর্ণযতি মানেন না, মানেন পদযতি। ২টি ছত্র পুরোপুরি উচ্চারণ করার পরে তিনি পুরো থামতে চান (কেবল 'ফুলিছে'-র পর), তার আগে নয়। অতএব তাঁর হিসেবে ২টি ছত্র মিলে এখানে ২টি পঙ্‌ক্তি।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অবশ্য চরণ-পঙ্‌ক্তি সমান। যেখানে সমান নয়, সেখানে দেখা যাবে পঙ্‌ক্তির মাপ চরণের চেয়ে বড়ো। এর কারণ, পর্ব আর পঙ্‌ক্তির মাঝখানে প্রবোধচন্দ্র যে অতিরিক্ত ছন্দ-বিভাগ 'পদ' কল্পনা করে নিয়েছে, তা ককনো কখনো 'চরণ'-এর সমান হয়ে যায়। আপনারা জানেন, কয়েকটি পর্ব মিলে তৈরি হয় 'পদ'। তেমনি, কয়েকটি 'পদ' জুড়ে তৈরি হয় পঙ্‌ক্তি। একটু আগে 'এ নহে মুখর'-এর ২টি ছত্র মিলে যে একটি মাত্র পঙ্‌ক্তি তৈরি হল, তার কারণ এক-একটি ছত্র প্রবোধচন্দ্রের কাছে এক-একটি 'পদ' বলেই মনে হয়েছে, তার বেশি নয়। অর্থাৎ, প্রথম ছত্রের শেষে অমূল্যধন পুরোপুরি থামলেও (পূর্ণযতি) প্রবোধচন্দ্র পুরো

থামছেন না, পর্বের শেষে যতটুকু থামতে হয় (পর্বযতি) তার চেয়ে একটু বেশি থামছেন (পদযতি)।

ফলে এখানে অমূল্যধনের 'চরণ' হয়ে যাচ্ছে প্রবোধচন্দ্রের 'পদ'-এর সমান। অতএব, ২টি 'পদ' নিয়ে তৈরি 'পঙ্‌ক্তি'

এখানে ২টি 'চরণে'রই যোগ ফল। নীচে লক্ষ করুন—

২ ১১ ২ | ১১ ২১১ | ১১১ || = ৬ + ৬+ ৩ = ১৫
ঐ আসে ঐ | অতি ভৈরব | হরষে ||

১১২১১ ১১ ২১১ ১১১
জলসিন্‌চিত ক্ষিতি সৌরভ রভসে = ৬ + ৬+ ৩ = ১৫

১১২১১ | ১১২১১ | ১১১ ||
ঘনগৌরব | নবযৌবনা | বরষা || = ৬ + ৬+ ৩ = ১৫
১১২১১ | ১১১ ||
শ্যামগম্ভীর | সরষা || = ৬+ ৩ = ৯

অমূল্যধনের হিসেবে এখানে ৪টি ছত্রই ৪টি চরণ। আর প্রবোধচন্দ্রের হিসেবে ৪টি ছত্রে আছে ৪টি পদ মিলে একটিমাত্র পঙ্‌ক্তি। প্রথম ৩টি চরণের মাপ ১৫-মাত্রা করে, চতুর্থটি ৯-মাত্রার। পঙ্‌ক্তিটির মাপ ১৫ + ১৫+ ১৫+ ৯ মাত্রা। চরণ আর পদ সমান হলে প্রবোধচন্দ্রের একপদী পঙ্‌ক্তি ছাড়া আর সব পঙ্‌ক্তিই মাপে চরণের চেয়ে বড়ো হবে গণিতের নিয়ম মেনে।

২৩.৬.৪ স্তবক, শ্লোক

ছন্দ-বিভাগ নিয়ে যেটুকু কথা হল, তা থেকে এটা বোঝা যাবে, পর্ব আর চরণ এই ২ রকম মাপের বিভাগ থেকেই উচ্চারণ আর বিরামের বিন্যাসের শৃঙ্খলাটা ধরা পড়ে যায়। কবিতার পদ্য পড়তে গেলেই চলতে থাকে পর্বের পর পর্ব উচ্চারণ, মাঝখানে অর্ধযতি। পরপর কয়েকটি পর্বের উচ্চারণ হলেই পড়ে পূর্ণযতি, শেষ হয় একটি চরণের উচ্চারণ। আবার চলতে থাকে একইভাবে পর্বের পর পর্ব পেরিয়ে আর-একটি চরণের উচ্চারণ আর-একটি পূর্ণযতি পর্যন্ত। এর সঙ্গে বাড়তি যে ২টি বিভাগের কথা আপনারা জানলেন (পর্বের চেয়ে ছোটো মাপের 'পর্বাঙ্গ' বা 'উপপর্ব' আর পর্বের চেয়ে বড়ো মাপের 'পদ'), ছন্দের মূল চরিত্র এদের বাদ দিলেও বুঝে নেওয়া যাবে। আর, 'পদ' বাদ পড়লে 'পঙ্‌ক্তি'ও অবান্তর হয়ে পড়ে। কেননা, 'পঙ্‌ক্তি'র ধারণা তৈরি হয় কয়েকটি 'পদে'র যোগফল হিসেবেই।

অতএব, কবিতা যখন পড়ি, তখন আমরা পর পর নির্দিষ্ট মাপের (মাত্রা সংখ্যার) চরণই একের পর এক উচ্চারণ করে যেতে থাকি। মনে রাখবেন, একটি কবিতার গোটা শরীরে যতগুলি চরণ ছড়ানো আছে, তাদের

ছন্দ-স্বভাব একটাই। সে-কারণে, কোনও কবিতার ছন্দ বোঝার জন্য গোটা কবিতাই পড়ে পড়ে দেখার প্রয়োজন নেই, কবিতার একটি অংশ এর জন্য বেছে নিলেই চলে। তবে, অংশটি এমন হওয়া চাই, যাতে থাকে মাপ বা মাত্রা সংখ্যার শৃঙ্খলায় বাঁধা পরপর কয়েকটি চরণ। এই রকম কয়েকটি চরণের গুচ্ছকে ছান্দসিকেরা বলেন স্তবক।

সাধারণভাবে 'স্তবকে'র অন্তর্গত চরণের সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়—২ থেকে ৮ পর্যন্ত, এমনকী তার চেয়েও বেশি হতে পারে। তবে, এ-বিষয়ে প্রবোধচন্দ্র একটু ভিন্ন কথা বলতে চান। তাঁর মতে 'স্তবকে'র পঙ্ক্তি-সংখ্যা কমপক্ষে ৫ হওয়া চাই-ই। তার চেয়ে কম হলে তার নাম হবে শ্লোক, 'স্তবক' নয়। ৫ বা তার বেশি সংখ্যার পঙ্ক্তির গুচ্ছও তাঁর কাছে বড়ো মাপের শ্লোক-ই, কেবল তার বিকল্প নাম 'স্তবক'। আমরা অবশ্য চরণের যেকেতানা গুচ্ছকেই বলব 'স্তবক'। নীচের 'স্তবক'গুলি উচ্চারণ করতে করতে বুঝে নিন, পরপর সাজানো চরণগুলি মাত্রা সংখ্যায় শৃঙ্খলায় কিভাবে পরপর বাঁধা পড়েল এক-একটি 'স্তবক' তৈরি করেছে—

১. এ জগতে হায় | সেই বেশি চায় | আছে যার ভূরি | ভূরি ‖ =৬+৬+৬+২= ২০
রাজার হস্ত | করে সমস্ত | কাঙালের ধন | চুরি ‖ =৬+৬+৬+২= ২০

২. নিত্ত তোমায় | চিত্ত ভরিয়া | স্মরর্ণ্ করি ‖ =৬+৬+৬+২= ২০
অন্তবিহীন | বিজনে বসিয়া | বরর্ণ্ করি ‖ =৬+৬+৫ = ১৭
তুমি আছ মোর্ | জীবন-মরণ্ | হরণ্ করি ‖ =৬+৬+৫ = ১৭

৩. মরিতে চাহি না | আমি সুন্দর ভুবনে ‖ ৮+৬ = ১৪
মানবের্ মাঝে আমি | বাঁচিবারে চাই ‖ ৮+৬ = ১৪
এই সূরযকরে এই | পুষ্পিত কাননে ‖ ৮+৬ = ১৪
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে | যদি স্থান্ পাই ‖ ৮+৬ = ১৪

৪. দুর্ভিক্ষ শ্রাবস্তীপুরে যবে ‖ = ১০
জাগিয়া উঠিল হাহারবে ‖ = ১০
বুদ্ধ নিজ ভক্তগণে | শুধালেন জনে জনে।
ক্ষুধিতেরে অন্নদানসেবা ‖ = ৮+৮+১০ = ২৬
তোমরা লইবে বল কেবা ‖ =১০

১ম স্তবকে ২টি চরণ (৬+৬+৬+২ মাত্রার), ২য় স্তবকে ৩টি চরণ (৬+৬+৫ মাত্রার), ৩য় স্তবকে ৪টি চরণ (৮+ ৬ মাত্রার), ৪র্থ স্তবকে ৪টি চরণ (১০ মাত্রার ৩টি, ৮+৮+১০ মাত্রার ১টি)।

২৩.৭ সারাংশ-২

পর্ব, পদ ঃ কবিতার ছত্র উচ্চারণ করতে গিয়ে মাঝে মাঝে একটুখানি থামতে থামতে পুরো ছত্র পড়ে ফেলি। ফলে পুরো ছত্রটি কয়েকটি টুকরোয় ভাগ হয়ে যায়। এক-একটি টুকরোর নাম 'পর্ব'। সমান সমান মাত্রার পর থামলে পর্বের মাপও পরপর সমান হবে। এ রকম একই মাপের পর্ব পরপর ঘুরে ঘুরে এলে তার নাম 'পূর্ণপর্ব'। 'পূর্ণপর্বে'-র চেয়ে ছোটো মাপের পর্বের নাম 'অপূর্ণপর্ব', আর বড়ো মাপের পর্বের নাম 'অতিপূর্ণপর্ব'। কবিতার ছত্রের শুরুতে, কখনো কখনো মাঝখানে ছোটো মাপের এমন পর্ব মাঝে মাঝে কবিরা ব্যবহার করেন, যা ছন্দের হিসেবের বাইরে। এ রকম অতিরিক্ত এবং প্রায় অনাবশ্যক পর্বের নাম 'অতিপর্ব'।

অমূল্যধনের অর্ধযতি বা প্রবোধচন্দ্রের পর্বযতি কবিতার ছত্রকে পর্বে পর্বে ভাগ করে। এই অর্ধযতি বা পর্বযতির চেয়ে একটু বেশি থামা, অথচ পূর্ণযতির চেয়ে একটু কম থামা প্রবোধচন্দ্র লক্ষ করে তার নাম দিলেন পদযতি। এই পদযতি ছত্রকে যেসব খণ্ডে ভাগ করে, তার নাম 'পদ'। কয়েকটি পর্ব নিয়ে তৈরি হয় 'পদ'।

কবিতার একই ছত্রে অমূল্যধনের পর্বের মাপ কখনো প্রবোধচন্দ্রের পর্বের সমান, কখনো তার চেয়ে বড়ো। তাই, প্রবোধচন্দ্রের 'পদ' কখনো অমূল্যধনের পর্বের সমান, কখনো বড়ো।

পর্বাঙ্গ, উপপর্ব ঃ

১টি পর্বকে ২টি-৩টি ভাগে উচ্চারণ করে এক-একটি ভাগকে অমূল্যধন বলেন 'পর্বাঙ্গ', আর প্রবোধচন্দ্র বলেন 'উপপর্ব'। দুজনের পর্বের মাপ যখন সমান থাকে, সেই পর্বের পর্বাঙ্গ আর উপপর্বও তখন সমান। কিন্তু, দুজনের পর্ব ছোটো-বড়ো হলে পর্বাঙ্গ-উপপর্বও হবে ছোটো-বড়ো। আবার, পর্বে পর্বে ভাগ না-হয়ে সরাসরি কয়েকটি উপপর্বে ভাগ হয়ে যায়, প্রবোধচন্দ্রের এ রকম ১টি পদ যদি অমূল্যধনের পর্বের সঙ্গে সমান মাপের হয়, তাহলেও পর্বাঙ্গ আর উপপর্ব সমান হবে।

চরণ, পঙ্‌ক্তি ঃ

পূর্ণযতি দিয়ে ভাগ-করা ছন্দ-বিভাগকে অমূল্যধন বলেন 'চরণ', প্রবোধচন্দ্র বলেন 'পঙ্‌ক্তি'। কবিতার কোনো কোনো ছত্রের শুরু থেকে সেই ছত্রের বা পরের কোনো ছত্রের শেষে-থাকা পূর্ণযতি পর্যন্ত যে ছন্দ-বিভাগ, তার নাম 'চরণ' বা 'পঙ্‌ক্তি'। অমূল্যধন আর প্রবোধচন্দ্রের পূর্ণযতি একই ছত্রের শেষে পড়লে 'চরণ' আর 'পঙ্‌ক্তি' একই হবে, ভিন্ন ভিন্ন ছত্রের শেষে পড়লে চরণ-পঙক্তি পৃথক্ হবে।

প্রবোধচন্দ্রের পর্ব আর পঙ্‌ক্তির মাঝামাঝি মাপের ছন্দ-বিভাগ পদ। কয়েকটি পদ জুড়ে তৈরি

হয় 'পঙ্‌ক্তি'। কখনো কখনো কবিতার এক-একটি ছত্র অমূল্যধনের কাছে তরণ হলেও প্রবোধচন্দ্রের কাছে তা এক-একটি পদ বলে গণ্য হতে পারে। তখনই পঙ্‌ক্তি হয়ে পড়ে চরণের চেয়ে বড়ো মাপের পৃথক ছন্দ-বিভাগ।

স্তবক, শ্লোক ঃ

কোনো কবিতার এমন একটি অংশ, যেখানে পরপর ২, ৩, ৪, ৫, ৬, বা ৮টি চরণের গুচ্ছ মাত্রাসংখ্যার শৃঙ্খলায় বাঁধা, তার নাম 'স্তবক'। প্রবোধচন্দ্রের বিচারে কমপক্ষে ৫টি পঙ্‌ক্তির গুচ্ছ হবে 'স্তবক'।

২, ৩ বা ৪টি পঙ্‌ক্তির গুচ্ছকে প্রবোধচন্দ্র বলেন 'শ্লোক'।

২৩.৯ মূলপাঠ-৩ ঃ উচ্চরাণের কয়েকটি স্বভাব

উচ্চারণের প্রক্রিয়া শুরু হয় ধ্বনির উচ্চারণ থেকে, এটা আপনারা জেনেছেন। তবে, ছন্দের হিসেব শুরু হয় দলের (অক্ষরের) উচ্চারণ আর উচ্চারণ-বিরতি থেকে—দলের মাত্রাগোনা আর যতি থেকে। দলের মাত্রা ১ না ২, ক-মাত্রার পর কতটুকু থামব—এর ওপর নির্ভর করেই গড়ে ওঠে ছন্দের চরিত্র। অথচ, বাংলা কবিতা উচ্চারণের এমন কয়েকটি স্বভাব রয়েছে, যা দুদিক থেকেই ছন্দের এই চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে। দলের উচ্চারণ কখনো হয় কেটে কেটে, কখনো টেনে টেনে, কখনো বাড়তি ঝোঁক দিয়ে, উচ্চারণ হয় কখনো সুর টেনে, কখনো একই ধ্বনির পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে। উচ্চারণের এই কটি স্বভাব বোঝার জন্য ৬টি পরিভাষার পরিচয় প্রথম এককের এই অংশে তুলে ধরা হচ্ছে।

২৩.৯.১ সংশ্লেষ, বিশ্লেষ

দলের বা অক্ষরের মাত্রা চিনতে গিয়ে জেনেছেন 'কেটে কেটে' আর 'টেনে টেনে' উচ্চারণের কথা। কেটে কেটে উচ্চারণে দল হয় ছোটো বা হ্রস্ব, মাত্রা যায় কমে (১-মাত্রা), আর, টেনে টেনে উচ্চারণে দল হয় একটু বড়ো বা দীর্ঘ, মাত্রা যায় বেড়ে (২-মাত্রা)। এই হ্রস্ব বা দীর্ঘ হওয়া দলের একটি স্বভাব, এবং তা ধরা পড়ে উচ্চারণ করার সময়। মুক্তদলের (স্বরান্ত অক্ষর) মূল স্বভাব হ্রস্ব উচ্চারণ, রুদ্ধদলের (হলন্ত অক্ষর) দীর্ঘ উচ্চারণ। সেই কারণেই, মুক্তদলের স্বাভাবিক উচ্চারণ ২-মাত্রায়। হ্রস্ব উচ্চারণে দলের হয় সংকোচন, দীর্ঘ উচ্চারণে প্রসারণ। মুক্তদলের উচ্চারণে সংকোচনটাই স্বাভাবিক, ১-মাত্রাও প্রায় নির্দিষ্ট। তবে খুব কম ক্ষেত্রেই তার প্রসারণও হয়, তখন তার উচ্চারণ হয় ২-মাত্রায়। যেমন—

১ ১ ১ ১ | ২ ২
হাঁটি হাঁটি | পা পা

এখানে 'হাঁটি হাঁটি'-র ৪-টি মুক্তদলের উচ্চারণই হ্রস্ব, সংকুচিত, মাত্র-ও ৪-টি। কিন্তু, 'পা পা' ২টি মুক্তদলেরই দীর্ঘ প্রসারিত উচ্চারণ, মাত্রা ২+ ২= ৪। মুক্তদলের এ-রকম প্রসারণ আপনারা লক্ষ করবেন ব্রজবুলিতে লেখা বৈষ্ণব কবিতায়, জনগণমনঅধিনায়ক-সংগীতে, আরো দুটি-একটি আধুনিক কালের কবিতায়।

অন্যদিকে, রুদ্ধদলের স্বাভাবিক উচ্চারণ দীর্ঘ বা প্রসারিত হলেও আবশ্যকমতো এর সংকোচনে বাধা নেই। আপনারা ক্রমে ক্রমে দেখবেন, কোনো কবিতার উচ্চারণে প্রতিটি রুদ্ধদল পায় ২-মাত্রা, কোনো কবিতায় ১-মাত্রা, আবার কোনো কবিতার একই স্তবকে একটি রুদ্ধদলে ১-মাত্রা, আর-একটিতে ২-মাত্রা। যেখানে রুদ্ধদলে ১-মাত্রা, সেখানে তার হ্রস্ব উচ্চারণ, সেখানে তার সংকোচন ; যেখানে রুদ্ধদলে ২-মাত্রা, সেখানে তার দীর্ঘ উচ্চারণ, সেখানে তার প্রসারণ। বাংলা কবিতায় রুদ্ধদলের এই সংকোচন-প্রসারণ অত্যন্ত ব্যাপক—এটা ক্রমশ

লক্ষ করবেন। উচ্চারণে এই সংকোচনের নাম সংশ্লেষ, আর প্রসারণের নাম বিশ্লেষ। অতএব, এখানে 'সংশ্লেষ' এর অর্থ রুদ্ধদলের হ্রস্ব উচ্চারণ, আর 'বিশ্লেষ'-এর অর্থ রুদ্ধদলের দীর্ঘ উচ্চারণ। নীচের তিনটি দৃষ্টান্ত লক্ষ করুন—

১ ২   ২ ১ | ১ ১   ১ ২ ১ | ১ ১ ২   ২ | ১ ১ ||
১. রাজার্   হসত্ | করে   সমস্ত | কাঙালের   ধন্ | চুরি || =৬+৬ +৬ +২

১ ১   ১ ১ | ১ ১   ১ ১ | ১ ১   ১ ১ | ১ ||
২. আঁধার   রাতে | বাধার্   পথে | যাত্রা   নাঙ্গা | পায় || =৪+৪ +৪ +১

১ ১ ১ ১   ১ ১ ২   ১ ১ ২ | ১ ১ ||
৩. ভালোমন্দ   দুক্খ-সুখ্   অন্ধকার্ | আলো || =৪+৪ +৪ +২ (প্রবোধচন্দ্র)

১ম উদাহরণে প্রতিটি রুদ্ধদলে (হলন্ত অক্ষর) ২-মাত্রা ; অর্থাৎ, প্রতিটি রুদ্ধদলেরই বিশ্লেষ, ২য় উদাহরণে প্রতিটি রুদ্ধদলে ১-মাত্রা, অর্থাৎ, প্রতিটি রুদ্ধলেরই সংশ্লেষ ; ৩য় উদাহরণে মন্ দুখ্ অন্—এই ৩টি রুদ্ধদলের ১-মাত্রা—এদের সংশ্লেষ, আর, সুখ্ কার্ ২-মাত্রার এদের বিশ্লেষ।

২৩.৯.২ শ্বাসাঘাত, প্রস্বর

বিনুর বয়স | তেইশ তখন | রোগে ধর্‌ল | তারে
ওষুধে ডাক্ | তারে
ব'াধির্ চেয়ে | আধি হল | বড়ো

ওপরের স্তবক থেকে প্রতিট পর্ব একটা একটা করে উচ্চারণ করে দেখুন—

প্রতি পর্বের প্রতিটি হলন্ত অক্ষরের (রুদ্ধদলের) উচ্চারণে একটু বাড়তি ঝোঁক পড়ছে অন্য অক্ষরের দলের তুলনায়। প্রতিটি অক্ষরেই থাকে একটি করে স্বরধ্বনি। অমূল্যধনের মতে, পর্বের অন্তর্গত কোনো অক্ষরের স্বরধ্বনির উচ্চারণ অন্য অক্ষরের স্বরধবেনির তুলনায় বেশি গম্ভীর হয়ে উঠলেই ঐ অক্ষরের ওপর বাড়তি ঝোঁক পড়ে। এরকম ঝোঁকের নাম তিনি দিলেন **শ্বাসাঘাত**। অমূল্যধনের বিচারে 'শ্বাসাঘাত' বিশেষ এক শ্রেণির কবিতার স্তবকের প্রতি পর্বেই থাকবে, থাকবে প্রতিটি হলন্ত অক্ষরের ওপর। তবে যে পর্বে হলন্ত অক্ষর নেই, সেখানে তা পড়বে পর্বের প্রথম বা দ্বিতীয় স্বরান্ত অক্ষরের (মুক্তদলের) ওপর। ওপরের স্তবকটিতে মোটা হরফে দেখানো প্রতিটি হলন্ত অক্ষরেই পড়ছে বাড়তি ঝোঁক বা 'শ্বাসাঘাত'। লক্ষ করুন, ছত্রশেষের অপূর্ণপর্বে ('তারে' 'তারে' 'বড়ো') আর শেষ ছত্রের দ্বিতীয় পর্বে ('আধি হল') হলন্ত অক্ষর নেই, কিন্তু ঝোঁক বা শ্বাসাঘাত আছে প্রথম বা দ্বিতীয় স্বরান্ত অক্ষরে।

প্রবোধচন্দ্রও দলের উচ্চারণে ঝোঁকের কথা মানেন। তবে তাঁর বিচারে সে-ঝোঁক তীব্র হয়ে পড়ে কেবল পর্বের প্রথম দলে। এই ঝোঁকের নাম প্রস্বর। পর্বের শেষে দিকে দুর্বল ঝোঁকের ঘা থাকলেও তার গুরুত্ব কম। প্রবোধচন্দ্রের উচ্চারণে ওপরের স্তবকটিতে **'প্রস্বর'** পড়বে *বি তে রো তা* ও *তা ব্যা আ ব*—এইসব মুক্তদলের ওপর, পর্বের প্রথম দল হবার কারণে। যেকোনো শ্রেণির কবিতার স্তবকেই 'প্রস্বর' থাকবে পর্বের প্রথম দলে।

তাহলে, 'শ্বাসাঘাত' আর 'প্রস্বরে'র মধ্যে মিল শুধু এইটুকু—উচ্চারণের এই দুটি স্বভাবই আসলে কোনো অক্ষর বা দলের ওপর বাড়তি ঝোঁক পড়া। আর, গরমিল এই—'শ্বাসাঘাত' পড়ে বিশেষ এক শ্রেণির কবিতার স্তবকে, প্রতি পর্বের প্রতিটি হলন্ত অক্ষরে (রুদ্ধদলে), পর্বে হলন্ত অক্ষর না-থাকলে প্রথম বা দ্বিতীয় স্বরান্ত অক্ষরে (মুক্তদলে)। কিন্তু, 'প্রস্বর' পড়ে যেকোনো শ্রেণির কবিতার স্তবকে, প্রতি পর্বের কেবল প্রথম দলে (মুক্ত বা রুদ্ধ যা-ই হোক)।

২৩.৯.৩ তান, মিল

মধ্যযুগ থেকে চলে আসছে বাংলা কবিতা পাঠের এমন একটি বিশেষ রীতি, যেখানে অক্ষরের (দলের) উচ্চারণ হতে হতে অক্ষরের অন্তর্গত ধ্বনির সঙ্গে মিশে থাকে অথবা ধ্বনিকে ছাপিয়ে উঠতে থাকে একটা টানা সুর। একালে অবশ্য সে-রীতির পাঠ অনেক কবিতার পক্ষেই অচল। তবু, বিশেষ এক-শ্রেণির কবিতার চরণ উচ্চারণ করতে গিয়ে অমূল্যধন এইরকম একটা সুরের টান লক্ষ করেছিলেন। সুরের এই টানটুকু তিনি বোঝাতে চাইলেন সংগীত থেকে তুলে-আনা তান কথাটি দিয়ে। অক্ষরের পর অক্ষরের উচ্চারণ যখন চলতে থাকে, তখন শ্রোতার কানে যেন চলতে থাকে ধ্বনির একটা প্রবাহ। নীচের দুটি ছত্র পড়ে পড়ে লক্ষ করুন কোথায় 'তান' আছে, আর কোথায় নেই ঃ

	১ ১ ১ ১ ২	১ ১	১ ১ ১	১ ২	
১.	মহাভারতের্	কথা |	অমৃত	সমান্ ‖	= ৮ + ৬

	১ ১ ১	১ ১ ১	১ ১	১ ২ ১ ২	১ ১ ২	
২.	একথা	জানিতে	তুমি |	ভারত্-ঈশ্‌শর	শাজাহান ‖	= ৮ + ১০

দেখা যাচ্ছে, ২টি চরণেই রয়েছে ২টি করে পর্ব। প্রথম পর্বের পথ ধরে ধ্বনির প্রবাহ চলতে থাকে দ্বিতীয় পর্বের দিকে। দুটি পর্বের মাঝখানে থাকা যতির জায়গায় ধ্বনির উচ্চারণ থেমে গেলেও একটু সুর কিন্তু থেকেই যায়। এই সুর বা তান পর্বদুটিকে যুক্ত করে ফেলে এবং দ্বিতীয় পর্বের ধ্বনির সঙ্গে মিশে যায়। রেশ থেকে যায় শ্রোতার মনে, চরণ শেষ হবার পরেও।

বাংলা ছন্দের আলোচনায় **মিল**-এর বিশেষ করে অন্ত্যমিলের গুরুত্ব ছান্দসিকেরা স্বীকার করে থাকেন। **মিল** হচ্ছে আসলে স্তবকের মাঝখানে একই ধ্বনির বা ধ্বনিগুচ্ছের পৃথক্ পৃথক অবস্থানে ফিরে ফিরে আসা। একই ধ্বনির বা ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি দুটি পর্বের শেষে হতে পারে, দুটি পদের শেষে হতে পারে, দুটি পঙ্‌ক্তি

বা চরণের শেষেও হতে পারে। পর্ব-পদ-পঙ্‌ক্তি-চরণ যায় শেষেই হোক, মিলটা শেষে থাকে বলে তার চলতি নাম **অন্ত্যমিল—**পর্বান্ত্য পঙ্‌ক্তি-অন্তক চরণান্ত্য মিল। নীচের দৃষ্টান্ত-কটি লক্ষ করুন—

১. পর্বান্ত্য মিল ঃ রণধারা বাহি | জয়গান গাহি | উন্মাদ কর | রবে

২. পদান্ত্য মিল ঃ পালিবে যে | রাজধর্ম ‖ জেনো তাহা | মোর কর্ম ‖
রাজ্য লয়ে | রবে রাজ্য | হীন

৩. পঙ্‌ক্তি-অন্তক মিল ঃ ওরে কবি | সন্ধ্যা হয়ে | এল
কেশে তোমার | ধরেছে যে | পাক
বসে বসে | উর্ধ্ব-পানে | চেয়ে ‖
শুনতেছ কি | পরকালের | ডাক

৪. চরণান্ত্য মিল ঃ ঝর্ণা ঝর্ণা | সুন্দরী ঝর্ণা ‖
তরলিত চন্দ্রিকা | চন্দন বর্ণা ‖

প্রথম দৃষ্টান্তে প্রথম-দ্বিতীয় পর্বের শেষে 'বাহি-গাহি'-তে 'আহি' ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি, তা থেকে পেলেন পর্বান্ত্যমিল। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে প্রথম-দ্বিতীয় পদের শেষে 'ধর্ম-কর্ম'-তে 'অর্‌ম' ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি, পাওয়া গেল পদান্ত্যমিল। তৃতীয় দৃষ্টান্তে পঙ্‌ক্তিদুটির শেষে 'পাক-ডাক'-এ 'আক্' ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি থেকে তৈরি হল পঙ্‌ক্তি-অন্তক মিল। সবশেষে চতুর্থ দৃষ্টান্তে চরণদুটির শেষে 'ঝর্ণা-বর্ণা'-তে 'অর্‌ণা' ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি এনে দিল চরণান্ত্য মিল।

২৩.১০ সারাংশ-৩

সংশ্লেষ, বিশ্লেষ ঃ

কেটে কেটে উচ্চারণের হ্রস্ব হওয়া, আর টেনে টেনে উচ্চারণে দীর্ঘ হওয়া দল বা অক্ষরের একটি স্বভাব। হ্রস্ব উচ্চারণে হয় দলের সংকোচন এবং ১-মাত্রা, দীর্ঘ উচ্চারণে হয় দলের প্রসারণ এবং ২-মাত্রা। মুক্তদলের (স্বরান্ত অক্ষর) উচ্চারণে সংকোচনই স্বাভাবিক এবং ১-মাত্রায় প্রায় নির্দিষ্ট। কোনো কোনো কবিতায় মুক্তদলের উচ্চারণে ঘটে প্রসারণ, তখন তার ২-মাত্রা।

রুদ্ধদলের (হলন্ত অক্ষর) উচ্চারণে প্রসারণই স্বাভাবিক, তখন তার ২-মাত্রা। তবে, সংকোচনে বাধা নেই, তখন রুদ্ধদলের ১-মাত্রা। রুদ্ধদলের উচ্চারণে এই সংকোচনের নাম 'সংশ্লেষ', প্রসারণের নাম 'বিশ্লেষ'। অর্থাৎ-এর অর্থ রুদ্ধদলের হ্রস্ব উচ্চারণ, 'বিশ্লেষ'-এর অর্থ রুদ্ধদলের দীর্ঘ উচ্চারণ।

শ্বাসাঘাত, প্রস্বর ঃ

পর্বের মাঝখানে কোনো অক্ষরের (দলের) স্বরধ্বনি অন্য অক্ষরের তুলনায় বেশি গম্ভীর হয়ে উঠলে সেই অক্ষরের ওপর যে বাড়তি ঝোঁক পড়ে, তাকে অমূল্যধন বলেন 'শ্বাসাঘাত'। বিশেষ এক শ্রেণির

কবিতার স্তবকে পর্বের প্রতিটি হলন্ত অক্ষরের (রুদ্ধদলের) ওপর, হলন্ত অক্ষর না-থাকলে পর্বের প্রথম বা দ্বিতীয় স্বরান্ত অক্ষত্ররের (মুক্তদলের) ওপর ‘শ্বাসাঘাত’ পড়ে।

প্রবোধচন্দ্রের মতে, যে কোনো কবিতার স্তবকে প্রতি পর্বের প্রথম দলের ওপর যে তীব্র ঝোঁক পড়ে, তার নাম ‘প্রস্বর’।

তান, মিল ঃ

বিশেষ এক শ্রেণির কবিতায় চরণের উচ্চারণে শ্রোতার কানে চলতে থাকে ধ্বনির প্রবাহ, চরণ শেষ হবার পরেও সুরের রেশ থেকে যায় শ্রোতার মনে। সুরের এই টানটুকুকে অমূল্যধন বলেন ‘তান’।

একই স্তবকের মাঝখানে পৃথক পৃথক পর্ব চরণ পদ বা পঙ্‌ক্তির শেষে একই ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছের ফিরে ফিরে আসাকে বলে মিল।

একক ২৪ □ বাংলা ছন্দের রীতিবিভাগ

গঠন

২৪.১ উদ্দেশ্য
২৪.২ প্রস্তাবনা
২৪.৩ মূলপাঠ
২৪.৩.১ দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান রীতি
২৪.৩.২ কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান রীতি
২৪.৩.৩ মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান রীতি
২৪.৪ সারাংশ
২৪.৫ অনুশীলনী
২৪.৬ গ্রন্থপঞ্জি

২৪.১ উদ্দেশ্য

২৪.২ প্রস্তাবনা

সব কবিতা ছন্দের দিক থেকে একই রীতি বা পদ্ধতিতে লেখা হয় না, একই কবির লেখা হলেও নয়, একই বিষয় নিয়ে লেখা হলেও না হতে পারে। এই রীতি বা পদ্ধতি কী ধরনের হবে, তা নির্ভর করে কবি যে নীতিতে

ধ্বনির পর ধ্বনি সাজিয়ে কবিতাটি লিখবেন, তার ওপর। বাংলা কবিতার ছন্দরীতি ক-রকমের হতে পারে, এ নিয়ে বহু বছর ধরে বিস্তর বিতণ্ডা চালিয়ে অবশেষে ছান্দসিকেরা মোটামুটি একমত হলেন, বাংলা কবিতায় কবিরা প্রধানত ৩-ধরনের ছন্দরীতিই ব্যবহার করে থাকেন। সংখ্যার বিতর্ক কেটে গেলেও নামের বিতর্ক এখনো কাটেনি। তবে, বিতর্ক থাকলেও প্রবোধচন্দ্র আর অমূল্যধনের তৈরি ৩-জোড়া নামই ছন্দজিজ্ঞাসুদের কাছে প্রিয়। এই এককের মূলপাঠ থেকে বাংলা কবিতার ছন্দরীতি বুঝে নিয়ে আপনারাই স্থির করতে পারবেন—কোন নাম কতখানি সার্থক।

২৪.৩ মূলপাঠ

বাংলা কবিতার ছন্দরীতি যে ৩টিই, এটা স্থির হয়ে যাবার পর রবীন্দ্রনাথ-সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-মোহিতলাল মজুমদার থেকে শুরু করে প্রবোধচন্দ্র সেন—অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত প্রত্যেক ছান্দসিক পৃথক পৃথক যুক্তি দেখিয়ে ৩টি ছন্দরীতির ৩টি করে নাম সুপারিশ করে গেলেন। শেষপর্যন্ত মোটামুটি বহাল রইল প্রবোধচন্দ্র অমূল্যধনের তৈরি নাম। প্রবোধচন্দ্রের কাছে যে রীতি দলবৃত্ত, অমূল্যধনের কাছে তা শ্বাসাঘাতপ্রধান ; প্রবোধচন্দ্রের কলাবৃত্ত-ই অমূল্যধনের ধ্বনিপ্রধান ; আর, প্রবোধচন্দ্রের মিশ্রবৃত্ত অমূল্যধনের কাছে তানপ্রধান। এঁদের পদ্ধতি পৃথক, সিদ্ধান্ত কখনো কখনো এক। কখনো দুজনের পদ্ধতি মেনে, কখনো একটিকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে পরপর ৩টি ছন্দরীতির আলোচনা করা হচ্ছে এই এককের মূলপাঠকে ৩টি অংশে ভাগ করে। এক-একটি অংশে পাবেন এক-একটি রীতির সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য দলের মাত্রা, সঙ্গে থাকবে দৃষ্টান্ত।

২৪.৩.১ দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান রীতি

দলবৃত্ত আর শ্বাসাঘাতপ্রধান একই ছন্দরীতির দুটি নাম। এ-রীতির ছন্দে প্রতিটি দলই হ্রস্ব এবং ১-মাত্রার, সে-দল মুক্ত বা রুদ্ধ যা-ই হোক। অর্থাৎ, দলই এখানে মাত্রা। এই কারণে এ-রীতির নাম প্রবোধচন্দ্র রাখলেন দলবৃত্ত। আবার, অমূল্যধন লক্ষ করলেন, এ-রীতিতে প্রতিটি পর্বে অন্তত পক্ষে ১টি করে শ্বাসাঘাত পড়ে-ই। অতএব, এর নাম হল শ্বাসাঘাতপ্রধান। নীচের দৃষ্টান্তগুলি একটা-একটা করে উচ্চারণ করতে করতে বুঝে নিন ঃ

(১) প্রতিটি দলের উচ্চারণ হ্রস্ব, ১-মাত্রার (কেটে কেটে)।

(২) যে দলের মাথায় মাত্রাচিহ্নের (১) ওপর রেফ্-চিহ্ন দেওয়া হল, তার উচ্চারণে আশপাশের অন্য দলের তুলনায় বাড়তি ঝোঁক বা শ্বাসাঘাত পড়েছে।

১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ||
১. হায়্ রে কবে | কেটে গেছে | কালিদাসের্ | কাল || = ৪ + ৪ + ৪ + ১
১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ||
পন্‌ডিতেরা | বিবাদ্ করে | লয়ে তারিখ্ | সাল্ || = ৪ + ৪ + ৪ + ১

১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১ ||
২. ইল্‌শে গুঁড়ি | ইল্‌শে গুঁড়ি | ইলিশ্‌ মাছের | ডিম্‌ || =৪ + ৪ + ৪ + ১

১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ | ১ ||
ইল্‌শে গুঁড়ি | ইল্‌শে গুঁড়ি দিনের বেলায় | হিম্‌ || =৪ + ৪ + ৪ + ১

লক্ষ করুন, ২টি দৃষ্টান্তেই প্রতিটি দল বা অক্ষরের মাথায় ১টি করে মাত্রার সংকেত। এটাও লক্ষ করুন, শ্বাসাঘাত পড়ছে প্রতিটি রুদ্ধদল বা হলন্ত অক্ষরের ওপর, যে-পর্বে রুদ্ধদল নেই সেখানে অবশ্য শ্বাসাঘাত পড়ছে পর্বের প্রথম বা দ্বিতীয় মুক্তদলের (স্বরান্ত অক্ষরের) ওপর।

প্রতিটি চরণের ডানদিকে দেওয়া অঙ্কগুলির দিকে তাকিয়ে দেখুন—

প্রতিটি পূর্ণপর্ব ৪-মাত্রার, শেষে অপূর্ণ পর্ব ১-মাত্রার। এ ছন্দরীতিতে প্রায় সব পূর্ণপর্বই ৪-মাত্রার হয়ে থাকে। তবে, প্রবোধচন্দ্র দলবৃত্ত রীতির কোনো কোনো পর্বে ৭মাত্রা ধার্য করে থাকেন। দেখুন এই দৃষ্টান্ত দুটি—

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১
১. আগুনের্‌ পরশ্‌মণি | ছোঁয়াও প্রাণে = ৭ + ৪

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১
এ জীবন্‌ পুণ্‌ণ্য করো | দহন্‌ দানে = ৭ + ৪

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
২. বাবুদের্‌ তাল্‌পুকুরে = ৭

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
হাবুদের্‌ ডাল্‌পুকুরে = ৭

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
সে কি বাস্‌ কর্‌লে তাড়া = ৭

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
বলি থাম্‌ একটু দাঁড়া = ৭

অমূল্যধন ৭-মাত্রার প্রতিটি পর্বই দুভাগে ভাগ করে নেবেন—হয় ৩+৪ মাত্রার ২টি পর্বে, না-হয় ৩-মাত্রার প্রথম পর্বটিকে অতিপর্ব হিসেবে গণ্য করে, ৪-মাত্রার পূর্ণপর্ব বের করে আনবেনই।

২৪.৩.২ ঃ কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান রীতি

যে ছন্দ-রীতি প্রবোধচন্দ্রের কাছে কলাবৃত্ত, তা-ই অমূল্যধনের কাছে ধ্বনিপ্রধান। প্রবোধচন্দ্রের দেওয়া হিসেব থেকে আগেই জেনেছেন—১-মাত্রার প্রতিটি দল হ্রস্ব এবং তার ধ্বনি পরিমাণ ১-কলা, ২-মাত্রার প্রতিটি দল দীর্ঘ, তার ধ্বনিপরিমাণ ২-কলা। এখন যে ছন্দ রীতির আলোচনা করছি, সেখানে প্রতিটি মুক্তদল সাধারণত হ্রস্ব, অতএব তার ধ্বনিপরিমাণ ১-কলা এবং মাত্রাও ১টি ; প্রতিটি রুদ্ধদল দীর্ঘ, অতএব তার ধ্বনিপরিমাণ ২-কলা এবং মাত্রা ২টি। অর্থাৎ 'কলা'-ই এখানে মাত্রা। এই কারণে এ-রীতির নাম কলাবৃত্ত।

প্রবোধচন্দ্র শেখালেন—'কলা' একটি নির্দিষ্ট ধ্বনিপরিমাণ, অতএব, 'কলাবৃত্ত' রীতিতে প্রতিটি দলের অন্তর্গত ধ্বনিপরিমাণের হিসেব নির্দিষ্ট, দলের মাত্রা-ও নির্দিষ্ট। অমূল্যধনও এ কথাই বলেন একটু অন্যরকম ভাষায়। তাঁর কথাতেও, এ-রীতিতে অক্ষরের (দলের) ধ্বনিপরিমাণটাই প্রধান। স্পষ্ট উচ্চারণে অক্ষরের অন্তর্গত প্রতিটি ধ্বনির হিসেব এখানে রাখতে হয়। এই কারণে, স্বরান্ত অক্ষর (মুক্তদল) এ-রীতিতে হ্রস্ব হলেও হলন্ত অক্ষর (রুদ্ধদল) দীর্ঘ হতে চায়। অর্থাৎ, স্বরান্ত অক্ষরে ১-মাত্রা আর হলন্ত অক্ষরে ২-মাত্রা নির্দিষ্ট। অক্ষরের ধ্বনিপরিমাণ বা ধ্বনির নির্দিষ্ট হিসেব থেকে মাত্রা নির্দিষ্ট হয় বলেই এ রীতির নাম **ধ্বনিপ্রধান**।

নীচের দৃষ্টান্তগুলি লক্ষ করুন ঃ

(১) প্রতিটি মুক্তদলের উচ্চারণ হ্রস্ব, ১-মাত্রার (কেটে-কেটে)।

(২) প্রতিটি রুদ্ধদলের উচ্চারণ দীর্ঘ, ২-মাত্রার (টেনে-টেনে)।

১ ১ ১ ১ | ২ ১ ১ | ১ ১ ২
১. খ্যাতি আছে | সুন্‌দরী | বলে তার্ =৪+৪ +৪
১ ১ ১ ১ | ২ ১ ১ | ১ ১ ২
ত্রুটি ঘটে | নুন্ দিতে | ঝোলে তার্ =৪+৪ +৪
(প্রবোধচন্দ্রের পর্ববিভাগ)

১ ২ ১ ১ | ২ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ ১ | ২
২. নূতন্ জাগা | কুন্‌জবনে | কুহরি উঠে | পিক্ = ৫+৫+৫+২
১ ২ ২ | ২ ১ ১ ১ | ১ ২ ২ | ২
বসন্‌তের্ | চুম্‌বনেতে | বিবশ্ দশ্ | দিক্ = ৫+৫+৫+২

২ ১ ১ ২ | ১ ১ ২ ১ ১ | ১ ১ ১
৩. ঐ আসে ঐ | অতি ভৈরব | হরষে = ৫+৫+৫+২
১১ ২১১ | ১ ১ ২ ১ ১ | ১ ১ ১
জলসিন্‌চিত | ক্ষিতি সৌরভ | রভসে = ৬+৬+৩

২ ১   ১   ১   ১ ১ | ১ ২   ১ ১   ১ ১ | ১ ২   ১ ১১১ | ১ ১
৪. মন্ত্রে সে যে পূত | রাখীর রাঙা সুতো | বাঁধন্ দিয়েছিনু | হাতে
=৭+৭+৭+২

১ ১ ১   ১ ১ ১   ১ ১ | ২ ১ ১১ ||
৫. তোমারে ডাকিনু যবে | কুন্জবনে || = ৮+৫
১ ১ ১   ১ ১ ১   ১ ১ | ২ ১   ১ ১ ||
তখনো আমের্ বনে | গন্ধ ছিল || = ৮+৫
(অমূল্যধনের পর্ববিভাগ)

৬. আম্রের্ মন্জরী গন্ধ বিলায় ||
২ ২   ২ ২   ২ ১ | ১ ২ ||
চম্পার সৌরভ্ শূন্ন্যে | মিলায় || =৮+৬
(অমূল্যধনের পর্ববিভাগ)

দেখা গেল, কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্পরধান রীতিতে পূর্ণপর্ব ৪-মাত্রা থেকে ৮-মাত্রা পর্যন্ত যেকোনা মাপের হতে পারে। তবে, অমূল্যধন অবশ্য প্রথম দৃষ্টান্তে ৮-মাত্রার পূর্ণপর্বই পাবেন ('খ্যাতি আছে সুন্দরী' আর 'ত্রুটি ঘটে নুন্ দিতে'), এ রীতিতে ৪-মাত্রার পূর্ণপর্ব তিনি মানেন না। অন্যদিকে প্রবোধচন্দ্র পঞ্চম দৃষ্টান্তে পাবেন ৮ আর ৫-মাত্রায় ২-টি জোড়া-পর্বের পদ, আর ষষ্ঠ দৃষ্টান্তে পাবেন ৪-মাত্রার পূর্ণপর্ব, ৮-মাত্রার পর্ব তিনি পারতপক্ষে মানেন না।

কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান রীতিতে মুক্তদল সাধারণত হ্রস্ব এবং ১-মাত্রার, এ কথা জানলেন। এরপর এই রীতিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুক্তদলের উচ্চারণ দীর্ঘ এবং ২-মাত্রার হতেও দেখবেন। ২-মাত্রার মুক্তদল পাবেন ব্রজবুলিতে লেখা বৈষ্ণব কবিতায়, 'জনগণমন অধিনায়ক' কবিতায়, এবং আধুনিক কালের দু-চারটি বাংলা কবিতায়। দৃষ্টান্ত দেখুন—

২ ১ ১   ২১ ১ | ১ ১ ১   ১ ২১ ||
১. মন্দির বাহির | কঠিন কপাট ||

১১ ১১ | ২ ২ | ২ ২
২. তব শুভ | নামে | জাগে

১১ ১১ | ২১ ১ | ২ ২
তব শুভ | আশিস | মাগে

২ ২ | ১ ১   ১ ১ | ২ ২
গাহে | তব জয় | গাথা (প্রবোধচন্দ্রের পর্ববিভাগ)

২ ১ ১ ২ ১ ১ | ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ |
৩. রে সতি রে সতি | কাঁদিল পশুপতি |
২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ||
পাগল শিব প্রমথেশ্ ||

২১ ২ ১ ১ ১ | ২ ১ ১ ১ ১ ১ ||
৪. নীল সিন্ধুজল | ধৌত চরণতল ||
১ ১১ ১ ২ ১ ১ | ২ ১ ১ ২১ ১ ||
অনিল-বিকম্পিত | শ্যামল অন্চল ||

মোটা হরফের প্রতিটি দলই মুক্তদল, তবু এদের উচ্চারণ দীর্ঘ এবং ২-মাত্রার। লক্ষ করুন, দীর্ঘ উচ্চারণ আর ২-মাত্রা পাওয়া প্রতিটি মুক্তদল এখানে বানানেও দীর্ঘস্বরান্ত (অর্থাৎ দলের শেষে আ-কার ঈ-কার এ-কার)। বানানে হ্রস্‌স্বরান্দ দলুগলি ১-মাত্রাই পেল। তাহলে ওপরের দৃষ্টান্তকটিতে দলের মাত্রাগোনার নিয়মটা এইরকম দাঁড়ায় ঃ

(১) প্রতিটি হ্রস্বস্বরান্ত মুক্তদলের হ্রসব উচ্চার, ১-মাত্রা।

(২) প্রতিটি দীর্ঘস্বরান্ত মুক্তদলের দীর্ঘ উচ্চারণ, ২-মাত্রা।

(৩) প্রতিটি রুদ্ধদলের দীর্ঘ উচ্চারণ, ২-মাত্রা।

তবে, ব্যতিক্রম কিছু কিছু থাকবেই, যেখানে মুক্তদল বানানো হ্রস্বস্বরান্ত হয়েও উচ্চারণে দীর্ঘ বা বানানে দীর্ঘস্বরান্ত হয়েও উচ্চারণে হ্রস্ব হতে পারে। এমনকী, রুদ্ধদলও কখনো কখনো উচ্চারণে হ্রস্ব হয়ে পড়ে। তাহলেও হ্রস্ব উচ্চারণে ১-মাত্রা আর দীর্ঘ উচ্চারণে ২-মাত্রা—এ নিয়ম সব সময় বহাল থাকবে। ছন্দরীতি অবশ্যই কলাবৃত্ত, তবু আগেকার দৃষ্টান্তগুলির তুলনায় এদের মাত্রারীতি একটু অন্যরকম, বিশেষ করে মুক্তদলের দীর্ঘ উচ্চারণ আর ২-মাত্রা পাওয়ার ক্ষেত্রে। সংস্কৃত কাব্য কবিতার ছন্দ অনুসরণ করে পুরোনো বাংলা কবিতায়, বিশেষ করে চর্যাপদে, এবং ব্রজবুলি ভাষায় লেখা বৈষ্ণব পদাবলিতে এ রীতির ব্যাপক প্রয়োগ হয়েছিল। এই কারণে প্রবোধচন্দ্র একে বলেন প্রাচীন কলাবৃত্ত। এর চলতি নাম অবশ্য 'প্রাচীন মাত্রাবৃত্ত' বা 'প্রত্ন কলাবৃত্ত'। তবে আধুনিক কালের কবিতায় এর প্রয়োগ কিছু কিছু যে হয়েছে, শেষ ৩টি দৃষ্টান্ত তারই নমুনা।

২৪.৩.৩ মিশ্রণ বা তানপ্রধান রীতি

বাংলা ছন্দের আর-একটি রীতিরও দুটি নাম পাশাপাশি চলছে—**মিশ্রবৃত্ত** আর **তানপ্রধান**। আমরা জেনেছি—দলবৃত্ত রীতিতে মুক্তদল ১-মাত্রার, রুদ্ধদলও ১-মাত্রার। কলাবৃত্তে মুক্তদল ১-মাত্রার, কিন্তু রুদ্ধদল ২-মাত্রার। আর, আমাদের আলোচ্য রীতিতে মুক্তদল ১-মাত্রায় নির্দিষ্ট হলেও রুদ্ধদল কিন্তু ১-মাত্রার হতে পারে, আবার ২ মাত্রারও হতে পারে। এটা নির্ভর করে রুদ্ধদলটি শব্দের (word) শুরুতে আছে, না মাঝখানে, না

শেষে—তার ওপর। শব্দের শুরুতে বা মাঝখানে থাকলে রুদ্ধদল হবে ১-মাত্রার, শেষে থাকলে ২-মাত্রার আপনার আগেই জেনেছেন,—রুদ্ধদলের ১-মাত্রা হয় দলবৃত্ত রীতিতে, ২-মাত্রা হয় কলাবৃত্ত রীতিতে। আলোচ্য রীতিতে প্রবোধচন্দ্র লক্ষ করলেন রুদ্ধদলের দুটি স্বভাবের মিশ্রণ—একটি ১-মাত্রার দলবৃত্ত-স্বভাব, আর একটি ২-মাত্রার কলাবৃত্ত স্বভাব। এর অর্থ, এ-রীতি আসলে দলবৃত্ত-কলাবৃত্তের মিশ্রণেই তৈরি। এই কারণে এ রীতির নাম হল **মিশ্রবৃত্ত**। ধরুন 'রুদ্ধদল' শব্দটি। এতে আছে ৩টি দল—রুদ্‌-ধ-দল্‌। 'রুদ্' আর 'দল্'—দলবৃত্ত রীতিতে ১-মাত্রার, কলাবৃত্ত রীতিতে ২-মাত্রার। কিন্তু, মিশ্রবৃত্ত রীতিতে 'রুদ্' ১ মাত্রা পায় শব্দের শুরুতে আছে বলে, আর, 'দল্' ২-মাত্রা পায় শব্দের শেষে আছে বলে। 'রুদ্'-এর ১-মাত্রা পাওয়াটা যেমন দলবৃত্ত স্বভাব, 'দল্'-এর ২-মাত্রা পাওয়াটাও তেমনি কলাবৃত্ত-স্বভাব।

'তান' কথাটি অমূল্যধন কী অর্থে ব্যবহার করেন, তা আপনারা আগেই জেনেছেন। এইমাত্র জানলেন, রুদ্ধদলের (হলন্ত অক্ষরের) মিশ্র স্বভাব দেখে এক শ্রেণির কবিতার ছন্দ-রীতিকে প্রবোধচন্দ্র বললেন **'মিশ্রবৃত্ত'**। সেই একই শ্রেণির কবিতা পড়তে পড়তে অমূল্যধনের কানে বাজতে থাকে একটা টানা সুর। এই টানা সুর বা সুরের টান বা 'তান'-কেই এ ছন্দরীতির বিশেষ লক্ষণ বলে তাঁর কাছে মনে হল। সেই কারণেই এ-রীতিকে তিনি বললেন **তানপ্রধান**।

এ 'তান' বা সুর সব শ্রোতার কানে না-ও বাজতে পারে। এ-রীতির 'তানপ্রধান' নামটিও তেমন পাঠক-শ্রোতার কাছে অর্থহীন বলে মনে হতে পারে। তবে, দলের মাত্রা নিয়ে একটু আগে যা লেখা হল, সে-বিষয়ে কোনো বিতর্ক নেই।

অতএব, যে ছন্দরীতিতে মুক্তদল ১-মাত্রার, রুদ্ধদল শব্দের শুরুতে বা মাঝখানে থাকলে ১-মাত্রার, শব্দের শেষে থাকলে ২-মাত্রার, তাকেই বলব **মিশ্রবৃত্ত**। স্তবক পড়তে পড়তে কানে সুর বাজুক বা না-ই বাজুক, ঐ মিশ্রবৃত্তেরই অন্য নাম তানপ্রধান।

ধরুণ নীচের দৃষ্টান্তটি—

১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ||
শুধু তব অন্‌তর্‌বেদনা || = ০ + ১০
১ ১ ২ ১ ১ ২ | ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ||
চিরন্‌তন্ হয়ে থাক্ | সম্‌রাটের্ ছিল এ সাধনা || = ৮ + ১০

লক্ষ করুন,

(১) শুধু ত ব ইত্যাদি প্রতিটি মুক্তদল ১-মাত্রা।

(২) শব্দের শুরুতে থাকা অন্ সম্ রুদ্ধদল-দুটি ১-মাত্রার।

(৩) শব্দের মাঝখানে-থাকা রন্ (চি-রন্-তন্) রুদ্ধদলটি ১-মাত্রার।

(৪) শব্দের শেষে থাকা তর্ (অন্-তর্), তন্, টের রুদ্ধদল-তিনটি ২-মাত্রার।

(৫) একটিমাত্র রুদ্ধদল দিয়ে তৈরি 'থাক্' শব্দটিও ২-মাত্রার।

এখানে ২টি কথা মনে রাখবেন—

(১) ‘অন্‌তর্‌বেদনা’ কথাটি ভাঙলে পাবেন ২টি পৃথক্‌ শব্দ ‘অন্‌তর্‌’ আর ‘বেদনা’। ‘তর্‌’ রুদ্ধদলটি ‘অন্‌তর্‌’ শব্দের শেষে আছে, তাই ২-মাত্রার। এ রকম ২টি বা ৩টি শব্দের সমাজে তৈরি জোড়-লাগা কথা ভেঙে নেবেন।

(২) ‘থাক্‌’ রুদ্ধদলটি শব্দের একমাত্র দল। এ রকম রুদ্ধদলে ২-মাত্রাই ধরবেন।

এবারে নীচের দৃষ্টান্তগুলিতে লক্ষ করুন ঃ

(১) প্রতিটি মুক্তদলে ১-মাত্রা।

(২) রুদ্ধদলে ১-মাত্রা শব্দের শুরুতে আর মাঝখানে।

(৩) রুদ্ধদলে ২-মাত্রা শব্দের শেষে

(৪) শব্দের একমাত্র রুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

২ ১১১১ ২ ১১১ ১১১
১. এই সূর্‌যকরে এই পুষ্পিত কাননে =৮+৬
১১১ ১২ ১১ ১১ ২ ২
জীবন্‌ত হৃদয়্‌-মাঝে যদি স্থান্‌ পাই =৮+৬

১১১ ১১১ ১১ ১২১২ ১ ১২
২. এ কথা জানিতে তুমি ভারত্‌-ঈশ্‌শর শা-জাহান্‌ =৮+১০
১১১১ ১১ ২ ১ ২ ১২ ১১২
কালস্রোতে ভেসে যায়্‌ জীবন্‌ যৌবন্‌ ধনমান্‌ =৮+১০

১১ ১১ ১১১১ ১২ ১ ২ ১১ ১১ ২১১
৩. নামে সন্‌ধ্যা তন্‌দ্রালসা সোনার্‌ আঁচল্‌-খসা হাতে দীপ্‌শিখা =৮+৮+৬
১ ২ ১ ২ ২ ১১ ১১ ১ ১ ২ ১১ ১১১১
দিনের্‌ কল্‌লোর পর্‌ টানি দিল ঝিল্‌লিস্‌স্বর্‌ ঘন যবনিকা =৮+৮+৬

১১১ ১১১ ১২ ১ ১১ ১২ ১১১ ২
৪. পৃথিবী ডাকিছে আপন্‌ সন্‌তানে বাতাস্‌ ছুটিছে তাই =৬+৬+৬+২
১১ ১১১১ ১২ ১১১ ১১১১ ১১ ২
গৃহ তেয়াগিয়া ভায়ের্‌ সন্‌ধানে চলিয়াছে কত ভাই =৬+৬+৬+২

এই দৃষ্টান্ত-কটি থেকে লক্ষ করলেন, মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান রীতিতে, পূর্ণপর্ব ৬, ৮ বা ১০-মাত্রার হতে পারে।

২৪.৩.৩ সারাংশ

বাংলা কবিতার ৩টি ছন্দরীতির চলতি নাম দলবৃত্ত-কলাবৃত্ত-মিশ্রবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান-ধ্বনিপ্রধান তান প্রধান। প্রথম ৩টি নাম প্রবোধচন্দ্রের দেওয়া, পরের ৩টি অমূল্যধনের।

দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান রীতি ঃ

যে ছন্দরীতিতে দল-ই মাত্রা, প্রবোধচন্দ্র তাকে বলেন 'দলবৃত্ত'। এ রীতির প্রতিটি পর্বে শ্বাসাঘাত লক্ষ করে অমূল্যধন এর নাম দিলেন 'শ্বাসাঘাতপ্রধান'। এ রীতির প্রতিটি দলের হ্রস্ব উচ্চারণ এবং ১-মাত্রা, পূর্ণপর্বে ৪-মাত্রা, অমূল্যধনের বিবেচনায় এ রীতির প্রতিটি পর্বে শ্বাসাঘাত পড়ে হলন্ত অক্ষরের (রুদ্ধদল) ওপর, হলন্ত অক্ষর না থাকলে প্রথম বা দ্বিতীয় স্বরান্ত অক্ষরের (মুক্তদলের) ওপর।

কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান রীতি ঃ

যে ছন্দরীতিতে কলা-ই মাত্রা, প্রবোধচন্দ্র তাকে বলেন 'কলাবৃত্ত'। যেহেতু, এ রীতিতে অক্ষরের (দলের) ধ্বনিপরিমাণটাই প্রধান, এবং ধ্বনির নির্দিষ্ট হিসেব থেকে অক্ষরের মাত্রাও নির্দিষ্ট হয়, সেই কারণে অমূল্যধন একে বলেন 'ধ্বনিপ্রধান'। এ রীতির প্রতিটি মুক্তদলের (স্বরান্ত অক্ষরের) হ্রস্ব উচ্চারণ ১-মাত্রা, রুদ্ধদলের (হলন্ত অক্ষরের) দীর্ঘ উচ্চারণ এবং ২-মাত্রা ; পূর্ণপর্বে ৪ থেকে ৭ মাত্রা প্রবোধচন্দ্রের হিসেবে, ৫ থেকে ৮ মাত্রা অমূল্যধনের হিসেবে।

সংস্কৃত কবিতার ছন্দ অনুসরণ করে পুরোনো বাংলাভাষায় লেখা চর্যাপদে আর ব্রজবুলিতে লেখা বৈষ্ণব পদাবলিতে এমন এক ধরনের 'কলাবৃত্ত' ছন্দরীতি প্রয়োগ করা হত, সেখানে দীর্ঘস্বরান্ত মুক্তদল ২-মাত্রা পায়। হ্রস্বস্বরান্ত মুক্তদলের ১-মাত্রা আর রুদ্ধদলের ২-মাত্রা অবশ্য বহাল থাকে। প্রবোধচন্দ্রের কথায় এ ছন্দরীতির নাম 'প্রাচীন কলাবৃত্ত'। আধুনিক কালের কিছু কিছু কবিতায় এ রীতির প্রয়োগ রয়েছে।

মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান রীতি ঃ

রুদ্ধদলের মাত্রার হিসেব দিয়েই প্রবোধচন্দ্র ছন্দরীতি নির্ধারণ করেন। প্রতিটি রুদ্ধদল যেখানে ১-মাত্রার, রুদ্ধদলের সেখানে দলবৃত্ত-স্বভাব, ছন্দরীতি সেখানে দলবৃত্ত। প্রতিটি রুদ্ধদল যেখানে ২-মাত্রার, রুদ্ধদলের সেখানে কলাবৃত্ত-স্বভাব, ছন্দরীতি সেখানে কলাবৃত্ত। কিন্তু, রুদ্ধদল যেখানে শব্দের শুরুতে বা মাঝখানে ১-মাত্রার, শব্দের শেষে ২-মাত্রার, সেখানে তার দুটি স্বভাবের মিশ্রণ—১ মাত্রার দলবৃত্ত-স্বভাব আর ২-মাত্রার কলাবৃত্ত-স্বভাব। ছন্দরীতিও তখন দুটি রীতির মিশ্রণে তৈরি। অতএব, এ রীতির নাম 'মিশ্রবৃত্ত'।

একই রীতির কবিতা পড়তে পড়তে একটা টানা সুর অমূল্যধনের কানে বাজতে থাকে বলে এই সুরের টানা বা 'তান'-কেই তাঁর এ রীতির বিশেষ লক্ষণ বলে মনে হত। অতএব, এ ছন্দরীতির নাম হল 'তানপ্রধান'। এ রীতেতে পূর্ণপর্বে সাধারণ ৬, ৮ বা ১০ মাত্রা।